HIDE RD.

'H' BLOCK

SERVICE STATION.

শ্রীমতী ইন্দিরা চন্দ।

পূর্ব্বাপর

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দুই টাকা

প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ নাথ
নাথ ব্রাদার্স
২৬-সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

- - শারদীয়া—১৩৩৮ - -

- - [redacted] -

প্রিন্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬নং চালতাবাগান লেন, কলিকাতা

পশ্চিমের এক নাম-করা শহর।—

আরম্ভ ত করিলাম, কিন্তু নিজের জীবনের যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া কেহ বা হয়ত আমার সহিত প্রেমের একনিষ্ঠত্ব লইয়া তর্ক তুলিবেন, কেহ বা হয়ত আমাকে লঘুচিত্ত এবং সুবিধাবাদী বলিয়া দোষারোপ করিবেন। তাঁহাদের মিলিত অভিযোগের উত্তরে এ-কথা আমি কখনই বলিব না যে, একদিন একজনকে ভাল বাসিয়াছিলাম বলিয়াই অনাগত সমস্ত জীবন ধরিয়া অন্যকে ভাল বাসিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিব—নিজের মনের উপর এমন জোর করিয়া নিষেধের পাষাণ-ভার চাপাইয়া তাহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশকে নিরুদ্ধ করিয়া এই যে আত্ম-নিগ্রহ, ইহার মধ্যে কোথাও কোন কল্যাণ নিহিত আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না; ইহার দ্বারা জীবনকে অনর্থক পঙ্গু এবং রুগ্ন করিয়াই তোলা হয়।—এ-সকল বাদ-প্রতিবাদ উত্থাপিত না করিয়া শুধু এই কথাই বলিতে চাহিব যে, এ-সংসারে বাঞ্ছিত এবং অবাঞ্ছিত হৃদয়াবেগের কত না অভিজ্ঞতাই ত নর-নারীর জীবনে প্রতিনিয়ত সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, আমার এ-কাহিনীও তেমনি একটি একান্ত নিজস্ব উপলব্ধির কথা। কোন জটিল তত্ত্বের সমাধান ইহার মধ্যে নাই, নাই কোন অমূল্য গবেষণা জগতকে উপহার দিবার

মহৎ উদ্দেশ্য; পথের ধারে নাম-গোত্র-হীন ফুলের মতো অপ্রয়োজনীয় আত্ম-প্রকাশেই ইহার সকল আনন্দ, চরম সার্থকতা। কিন্তু কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম!

পশ্চিমের এক নাম-করা শহর। তাহাকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া যে ক্ষীণ-কায়া নদীটি বহিয়া গিয়াছে, তাহাকেই সেতু দিয়া বাঁধিতে হইবে। উপরওয়ালা বলিয়া দিলেন,—এই সামান্য কাজের জন্য তিনি আর কি যাইবেন—আমি একাই যথেষ্ট। তথাস্তু। লোকজন লইয়া একদিন রাত্রিশেষে যাত্রা করিলাম।

মাসখানেক কাটিয়া গিয়াছিল। কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। নাবি-বর্ষার মাটি কিছুতেই তেমন পাকা হইয়া বসে না। এক-একটা পিলারের ভিত্তি স্থায়ী করিতেই এক সপ্তাহ কাটিয়া যায়।

প্রত্যহ সকালে তদারকে বাহির হই। ফিরিতে দ্বিপ্রহর গড়াইয়া যায়। তাঁবুর ভিতর এমনি ভাবের নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করা, অন্যের যেমনই লাগুক, আমার কাছে ইহা রৌদ্র-বৃষ্টির মতোই সহজ সহনীয় হইয়া গেছে। তাই পরম আরামেই দিনের পর দিন যাপন করিয়া চলি। বিশেষ করিয়া, স্থানটি আমায় অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছে। প্রত্যূষে সূর্য্য ওঠার সঙ্গে অগণিত শ্রমজীবীদের কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের সুর, প্রখর স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের

পূর্ব্বাপর

বিস্তীর্ণ আলস্য, গোধূলির ম্লানায়মান সূর্য্যাস্ত-দীপ্তি,—ইহাদের সহিত নিজের জীবনের ছন্দের সুর মিলাইয়া একটা অবিচ্ছিন্ন সঙ্গতি অনুভব করি।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও বৈকালের দিকে সুরথবাবু আসিলেন। ভদ্রলোকটিকে পাইয়া প্রবাসের নিঃসঙ্গতার ভার অনেকখানি লঘু হইয়াছে। এমন সরল প্রকৃতির লোক সংসারে সচরাচর চোখে পড়ে না। সাহিত্যে কয়েকটা বড় বড় ডিগ্রী আছে; স্থানীয় কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। সম্প্রতি, স্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্যে কর্ম্ম হইতে বাধ্য হইয়া অবসর লইয়াছেন। কলেজের কর্ম্ম নাই থাক, গৃহে সকল সময়েই প্রাচীন পুথির বর্ণোদ্ধার, পুরানো ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা লইয়া ব্যস্ত থাকেন। জীবন তাঁহার নিবেদিত তাহারই সাধনায়।

তাঁবুর ভিতর মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—এই যে, তৈরী? চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।

দুইজনে আমরা প্রত্যহ নদীর তীর ধরিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতাম। বৈকালিক চা-পান সমাপন করিয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। বাহির হইলাম।

পূর্ব্বাপর

সুরথবাবুর মতো এত বড় বক্তার লোক আর দুটী দেখি নাই। তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার সূক্ষ্মতত্ত্বের কিছুই বুঝি না; কিন্তু তাহারই সুদীর্ঘ এবং বিস্তারিত বিবরণের উত্তরে উপলব্ধি-সূচক মস্তক-সঞ্চালন করিতে হইত এবং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। ভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ সঙ্গতি কি কোথাও দেখিব না; না হইলে, এত বড় প্রতিভার মধ্যে এতখানি উৎকেন্দ্রিয়তা আশ্রয় পাইল কেমন করিয়া?

সেদিন কিন্তু সহসা অন্যরূপ প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন, বলিলেন—আচ্ছা, কৈ, আপনি ত একদিনও আমাদের বাড়ী গেলেন না?

বলিলাম—তার আর কি! একদিন গেলেই হ'ল।

সুরথবাবু বলিলেন—হ্যাঁ; আমার স্ত্রীও তাই বলছিলেন—রোজ রোজ তুমি শৈলেশবাবুর তাঁবুতে গিয়ে তাঁর চা-কেক ইত্যাদির শ্রাদ্ধ ক'রে আসো, অথচ ভদ্রলোককে একদিনও তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলে না; আমরাও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রইলাম। এই বলিয়া সুরথবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

বলিলাম—আপনার স্ত্রীকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন—যবে তিনি আদেশ করবেন, আমি গিয়ে হাজির হব। কিন্তু বেশ ত আছি, দু-একদিন তাঁর হাতের আতিথ্য

গ্রহণ করা আমার পক্ষে শাকের ক্ষেত দর্শন করা হবে বৈত নয়!

স্নুরথবাবুর উচ্চকণ্ঠের হাসির স্বর নদীর বুকে বহুদূর অবধি সঞ্চারিত হইয়া গেল।

ব্রীজের কাজ অগ্রসর হইতেছে। স্নুরথবাবু প্রত্যহ আসিতেছেন এবং আমাকে তাঁহার বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। সেদিন কথা দিয়াছিলাম।

শহরের উত্তর দিকে যে-পথটি একটু ঘুরিয়া গিয়া সোজা চলিয়া গেছে, তাহারই কিছুদূর গিয়া স্নুরথবাবুর ফাঁকা ছোট্ট দ্বিতল বাড়িখানি চোখে পড়ে। সম্মুখে গেটের চারিধারে নানা রকম মরশুমি ফুলের গাছ। গেটের পিছনে লাল-কাঁকরের পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া বাড়ীখানিকে বেষ্টন করিয়া আছে। গেটের নিকট উপস্থিত হইতেই গৃহস্বামী হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। লাল-রাস্তা পার হইয়া দুইজনে সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় পিছন হইতে কিসের একটা অস্পষ্ট সৌরভ ভাসিয়া আসিল; সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কণের শব্দও যেন শুনিতে পাইলাম।

সুরথবাবু বলিলেন—আমার স্ত্রী এসেচেন।

ও! বলিয়া দুই হাত একত্র করিয়া মুখ ফিরাইলাম।

পৃথিবীতে সত্যকারের আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় কোন কিছুই নাই! যুক্তকর তেমনিই রহিল; মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—তুমি!!

সুরথবাবু সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। আমার মনে হইল, ইহার পর আর বোধ করি ভাষা খুঁজিয়া পাইব না।

অপরিমিত হাসিতে হাসিতে সুরথবাবু বলিলেন—কেমন surprise দিইছি? হাঃ, হাঃ, হাঃ! কিছুতেই আগে পরিচয় দিই নি। কেমন—

এই বলিয়া তিনি ভিতরের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, জীবনে এত বড় প্রকাণ্ড রসিকতা তিনি যেন আর কখনো কাহারো সহিত করেন নাই।

বোধ করি মুহূর্ত্তকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল; পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিলাম—এমন ভাবে পরিচয় গোপন ক'রে স্বামীকে দিয়ে আহ্বান—এর কোন নিহিত অর্থ আছে নাকি?

—দেখছিলাম, পরস্ত্রীর ওপর আজো তোমার কতখানি লোভ আছে। যাক, দেখে আশ্বস্ত হলাম। বাবা, ও কতদিন ধ'রে যে খোসামোদ করতে হয়েছে তার ঠিক নেই।

পূর্ব্বাপর

—পৃথিবীটার পরিধি সত্যিই কি আশ্চর্য্য-রকম কম সুনন্দা! কাল পর্য্যন্ত বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না যে, এমন জায়গায় তোমার সঙ্গে এমন ভাবে দেখা হ'তে পারে! কিন্তু তুমি যে হঠাৎ তোমার কথার মধ্যে 'আজো' কথাটার ওপর কি অর্থে জোর দিলে তা ত বুঝলাম না?

সুনন্দা মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল—তোমার সব জানা-শোনা কি এইখানে দাড়িয়ে দাঁড়িয়েই শেষ ক'রে নিতে চাও? এসো, ভিতরে এসো।

সম্পূর্ণ-সুন্দর সুসজ্জিত গৃহস্থলী; তাহারই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী আজিকার সুনন্দার সহিত পূর্ব্বেকার সে-সুনন্দার কোন সাদৃশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শরৎ-উষায় যাহাকে বিদায় দিয়াছিলাম, তাহাকে দেখিলাম বসন্তের প্রদীপ্ত সমারোহের মাঝে।

একটি একটি করিয়া জীবনের সকল কথাগুলি জানিয়া লইয়া হাসিয়া সুনন্দা বলিল—সমস্তটা জীবন কাব্য ক'রেই কাটাবে নাকি? বিয়ে-থা করতে হবে না?

মনে মনে বলিলাম—পরিপূর্ণতার তৃপ্তিতে সার্থক হইয়া তুমি না-হয় আমার কাছে আজ একান্ত সহজ হইয়াই আসিতে পারিলে; কিন্তু অপরের কাছে আজো যাহা সহজ হয় নাই, তাহার সেই গোপন দুর্ব্বলতার সুবিধা নেওয়া, এ কেবল তুমি বলিয়াই পারিলে। কিন্তু তাই বলিয়া আজ আর তোমাকে আত্মপ্রসাদের গর্ব্ব অনুভব করিবার অবসর কোনমতে দিব না।

সহজ কণ্ঠে বলিলাম—না করবার ধনুর্ভঙ্গ পণ ত কিছু করি নি; কিন্তু তেমন সুবিধা-মতো মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না;—এক-জায়গায় ত কথাবার্ত্তা সব ঠিক হ'য়ে আছে (এটা মিথ্যা), কিন্তু আমার তেমন মত নেই। দেখ না, তোমার সন্ধানে—

—ঘটকালির ফী কি দেবে?

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুরথবাবু আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। প্রিয়তমার মুখের প্রতি চাহিয়া স্মিত-প্রফুল্লমুখে বলিতে লাগিলেন—ওঃ, কত কষ্টে যে তোমার পরিচয় ওঁর কাছে গোপন ক'রে রেখেছিলাম, তার সীমা নেই। তুমি ত ব'লে খালাস—'দেখ, গোড়াতে ওঁর কাছে আমার নাম কিছুতেই কোরো না'; কিন্তু আমার যে কী অবস্থা তা ত জানো না; উনিও কিছুতেই আসবেন না, আমিও নাছোড়বান্দা।

জলযোগের সহিত অনেক কথা হইল। আমার এই সহায়-সঙ্গীহীন জীবন-যাত্রার প্রতি সুরথবাবু অনেকখানি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন; তারপর বলিলেন—বলছিলাম কি শৈলেশ-বাবু,—আর যে-কটা দিন এখানে আছেন, ক্যাম্পে না থেকে আমাদের এইখানেই থাকুন না? সুনন্দাও তাই বলছিল। আমরা ত আপনার একেবারে পর নই।

সুনন্দার প্রতি তাকাইলাম। তাহার উত্তর-প্রত্যাশী দুই-চোখের দৃষ্টি যেন আমার চোখের উপর পথ হারাইয়াছে।

হাসিয়া বলিলাম—আপনাদের এই সহানুভূতি সত্যিই আমার মনকে খুসীতে ভরিয়ে দিলে; সংসারে আজো যে কেউ আমার জন্যে একটুখানিও ভাবে,—এ-কথা জেনে আমি যে কি আনন্দ পেলাম, তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমি ত বেশ আছি; কাজ কি আপনাদের এই সাজানো বাগানে আগাছার জঞ্জাল বাড়িয়ে।

আপনার সঙ্গে কথায় কে পারবে বলুন, বলিয়া সুরথবাবু প্রস্থান করিলেন।

বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পৃথিবীর উপর বহুক্ষণ হইল সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে; বলিলাম—অনুমতি কর ত এইবার উঠি।

সুনন্দা মুখ নীচু করিয়া বসিয়া ছিল, আমার সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—আর কতদিন তোমার এখানে কাজ হবে?

—ঠিক বলতে পারি না; তবে আশা করছি, মাসখানেকের মধ্যেই পোলের শেষ-পন্টুনখানা ভাসাতে পারব।

—আমি বলছি, সে-কদিন তাঁবুর বাসা তুলে এইখানে এসে থাক। কোনও অসুবিধে তোমার হবে না।

সুনন্দার কণ্ঠস্বরে সুদূর অতীতের মাঝে ফিরিয়া গেলাম।

তখনকার দিনের তেমনি-তর আদেশের সুরই যেন তাহার কথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে শুধু একটুখানি হাসিলাম ; কথা বলিলাম না।

আমার ও-হাসির অর্থ সে ভালো করিয়াই জানে ; বলিল—আপত্তিটা কিসের শুনি ? তাঁবুর ভিতর বর্ষার জল পড়ে, এ ত তুমি নিজেই স্বীকার করলে ; আর তারই মধ্যে যে, কোন মানুষ সুস্থচিত্তে দিন কাটাতে পারে, তা ধারণা করা অসম্ভব। নিজে রেঁধে খাওয়া-দাওয়া তোমার দ্বারা যে কতদূর কি হয়, তা আমিই জানি। তাই বলছি—

তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম—পরিচিত-জনের প্রবাস-বাসের দুঃখ নিজের হাতে তুলে নিতে চাইছ,—তোমার এ মহত্ত্ব আমি চিরদিন সকৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করব। কিন্তু ওর মধ্যেই আমার এতগুলো দিন কেটেছে, বাকী অসংখ্য দিনগুলোও ওরই মধ্যে দিয়ে আমায় কাটাতে হবে। শুধু শুধু মাঝখান থেকে দিনকতক আরাম উপভোগ করলে অভ্যাস খারাপ হবে বৈত নয়! তোমার পরোপকার-প্রবৃত্তি চিরজীবী হোক্, সুনন্দা ; আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।

মনে মনে বলিলাম—নিজের সম্পদের গর্ব্বে আমার সম্বন্ধে তুমি না হয় আজ নিঃশঙ্ক-চিত্ত হইয়াছ ; কিন্তু যাচিয়া তোমার আতিথ্য-গ্রহণ করিবার পশ্চাতে অন্তরের যে দীনতা লুক্কায়িত আছে, তাহা মাথা পাতিয়া লইবার মতো ছোটও আমি নই।

পূর্ব্বাপর

দুইজনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই অদূরে অস্পষ্ট সন্ধ্যা লোকে বাগানের ভিতর সুরথবাবুকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার গাছের সখের কথা শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা যে কত উগ্র, তাহা এখন প্রত্যক্ষ করিলাম। মাটির উপর বসিয়া একটা ছোট কোদাল লইয়া সম্মুখের মৃত্তিকা নাড়াচাড়া করিতেছেন এবং পাশের মালীটাকে বোধ করি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন। হাতে-পায়ে, জামা-কাপড়ে ভিজা-মাটির স্নেহ-স্পর্শ লাগিয়াছে; সম্মুখে মাটির উপর একখানা ছবি-আঁকা পাতা-খোলা বই পড়িয়া রহিয়াছে।

কাছাকাছি আসিতেই তিনি হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর আমাকে উদ্দেশ করিয়া কি বলিবার উপক্রম করিলেন,—কিন্তু মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল, সহসা সুনন্দা উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—মাগো! আবার তুমি শুধু-পায়ে ভিজে-মাটিতে ব'সে আছ? তারপর একেবারে স্বামীর বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া তর্জ্জনী হেলাইয়া বলিল—কতদিন না তোমায় বলেছি, সন্ধ্যেবেলা এমন ক'রে ঠাণ্ডা লাগিয়ো না! তুমি কি একদিনও আমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না? যাও, এখুনি কাপড় ছেড়ে মোটা-জামা গায়ে দিয়ে এসো।

অকস্মাৎ পত্নীর এই প্রবল উচ্ছ্বাসে সুরথবাবু অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন; বলিলেন—এ আবার কি! কবে আবার—? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি এখুনি গরম জামা গায়ে দিয়ে

আসছি, ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি বাড়ীর ভিতর প্রস্থান করিলেন। সুনন্দা নির্নিমেষ-নয়নে স্বামীর গমন-পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরথবাবুর শরীরে যে কঠিন অসুখ আছে, তাহা তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছিলাম; বলিলাম—হ্যাঁ; রোগী মানুষ, এমন-ক'রে ঠাণ্ডা লাগানো উচিৎ নয়।

—কত বলি; কিন্তু কে-বা কার কথা শোনে। আমি আর পারি নে!

কম্পিত কণ্ঠস্বর কান্নার আভায় অপরূপ হইয়া উঠিল। ইহার পর আর বাক্‌বিস্তার করা সম্ভবপর হইল না। নিঃশব্দে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

২

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, রাত্রি অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। আকাশ যেন এক খণ্ড ঘন-কৃষ্ণ চন্দ্রাতপ; তাহারই গায়ে তারাগুলো যেন আজ অধিকতর দীপ্যমান। রাত্রি অমাবস্যা।

যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখিলাম, উদার উন্মুক্ত পথ দূরে বহুদূরে অসীম আকাশের গায়েই বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই পথ দিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, কতদিন ধরিয়া কে জানে?

সুনন্দার কথাগুলো তখনো কানের ভিতর ঝঙ্কৃত হইতেছিল;

নিজেকে সে আজ সর্ব্বতোভাবে আমার দিক হইতে মুক্ত করিয়া লইয়াছে—এ সংবাদ দিনের আলোর মতোই আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ভালোই হইয়াছে যে, তাহার জীবন হইতে সে আজ আমাকে এমন অনায়াসে নিষ্কাসিত করিতে পারিয়াছে ; মনে মনে মুক্তির আনন্দ অনুভব করিবার নিমিত্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে গেলাম ; কিন্তু ফেলিতে গিয়া দেখি কোথা হইতে একটা অনির্দ্দেশ্য কাঁটার আঘাতে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়।

সহসা মনে হইল, এই যে অনন্ত-বিস্তীর্ণ পথ-রেখা, সুবিশাল নীলাকাশ, স্নিগ্ধ-শান্ত পৃথিবী, ইহারা একান্তই অর্থহীন অকারণ, এবং ইহাদের সঙ্গে আমার জীবনও নিখিল বিশ্বের সুবিন্যস্ত সুসঙ্গতির মাঝে এমনি এক উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি।

একে একে সকল কথাই মনে পড়িতে লাগিল ; বিশেষ করিয়া একটি দিনের একটি কথা। গ্লাস্‌গোর এক বসতি-বিরল শহরতলীর নির্জ্জন গৃহকোণে বসিয়া যেদিন সুনন্দার বিবাহের সংবাদ পাইলাম, সেদিন মনে হইয়াছিল এতখানি দুঃখের আঘাত সহ্য করিবার শক্তি বোধ করি আমার নাই। মনে হইল, এতদিনের এই কঠোর পরিশ্রম, কৃতী হইবার এই প্রবল উচ্চাশা,—ইহার পর সবই যেন প্রয়োজনহীন হইয়া পড়িল। নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মতো নিজেকে যেন নিতান্ত লক্ষ্যহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ছন্দের উপর অধিকার

ছিল, লাইনের শেষে অনবদ্য মিল গাঁথিতেও পারিতাম,—কিন্তু তাই বলিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদুনি গাহিয়া বাণীর জ্যোৎস্না-স্মিত কমল-কুঞ্জে অমাবস্যা ঘনাইয়া তুলিবার প্রবৃত্তি ছিল না ; রুগ্ন-চিত্ত ভাব-বিলাসীর মতো নয়, স্বাস্থ্যবান সৈনিকের মতোই আমার অনতিবর্ত্তনীয় দুঃখকে বরণ করিয়া লইলাম।

জানি, এই নিঃশব্দ ব্যর্থতার ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া যুগে যুগে অনেক বেদনাতুর কাব্য, অনেক বিক্ষুব্ধ কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে ; কিন্তু আজিকার আয়ত্তাতীত সম্পদ একদিন আমারও হইতে পারিত বলিয়া নিস্ফল হতাশ্বাসে প্রবাসের দিনগুলা ভারী করিয়া তুলি নাই ; যথাক্রমে দুই-তিনটা পরীক্ষা পাশ করিয়া, সনন্দ লইয়া দেশের ছেলে দেশে ফিরিলাম।

লোকালয়ের ভিতর দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিলাম। পথের দুই ধারে ছোট ছোট কুটীর ; তাহারই অধিবাসীবৃন্দ এতক্ষণে রাত্রের আহার সমাধা করিয়া, কেহ বা রামায়ণ, কেহ বা ভজন, কেহ বা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার বাসিন্দারা সকলেই দিন-মজুর, আমরা যাহাদের ছোটলোক বলিয়া অভিহিত করি, তাহাই। অট্টালিকা নাই, সাজসজ্জা নাই, আরামপ্রদ বিলাসের কোন উপকরণ ত দূরের কথা, জীবনকে সুসহ করিবার জন্য যাহা একান্ত

প্রয়োজনীয়, তাহাও হয়ত সকলের নাই,—তবুও ইহাদের দেখিলে মনে হয়, যে-সুখ যে-শান্তিটুকু ইহারা জীবনে আহরণ করিতে পারিয়াছে, ধনীর প্রাসাদেও তাহাকে কোনদিন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

সহসা গতি রুদ্ধ হইয়া গেল; সম্মুখের স্বল্প-দীপালোকিত একটি গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া চোখের যেন আর পলক পড়িতে চাহিল না। যাহা দেখিলাম তাহা অসাধারণও নয়, অদৃষ্টপূর্ব্বও নয়; কিন্তু তাহাই যেন আজ আমার চোখে একান্ত অপূর্ব্ব এবং রমণীয় হইয়া ফুটিয়া উঠিল। একটি ক্ষুদ্র শ্রমিক পরিবার। স্ত্রী আলোর সম্মুখে বসিয়া কোলের ক্রন্দন-নিরত শিশুটিকে ঘুম-পাড়ানী গানের সুরে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছে; শিশু কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইবে না, হাত-পা ছুঁড়িয়া বারবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। অদূরে খাটিয়ার উপর স্বামী বসিয়া লুব্ধনেত্রে স্ত্রীর প্রতি তাকাইয়া আছে; তাহার প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিবার সময় স্ত্রীর মুখের উপর দুষ্টামির যে বাঁকা হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা স্বামীর নজরে পড়িতেছে না।

সভ্যতা-জ্ঞান-হীন, অসামাজিক নর-নারীর জীবন-যাত্রা-পথের এই অনাবৃত ছবিখানি আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল। চলিতে চলিতে মনে হইল, আমিও যদি এমনি একখানি অনাড়ম্বর শান্তির নীড় রচনা করিতে পারিতাম! সমাজ, সংস্কার এবং

লোকালয়ের বাহিরে এমনি একখানি নির্জ্জন কুটীর, এমনি একটি দেবতার শুভ্র-শুচি আশীর্ব্বাদ, এমনি একজন সেবা-পরায়ণা স্ত্রী—

সহসা চকিত হইয়া উঠিলাম। মনের ভিতরকার সংস্কার-বদ্ধ সামাজিক-জীবের ক্ষুব্ধ ধিক্কারে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। সঙ্কোচের আর অবধি রহিল না। আমার শান্তিমৌন গৃহাঙ্গনে স্নেহ-কোমল পত্নীর যে অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সে-মুখ সুনন্দার!

তাঁবুতে ফিরিয়া শুনিলাম, আমার আজিকার এই বিলম্ব দেখিয়া লোকজন লইয়া সহকারী নান্নুলাল আমাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে।

পরদিন সাহেবকে তার করিলাম—রিইন্‌ফোর্সমেণ্ট্ প্রয়োজন; এখানকার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিতে চাই।

সেদিন যখন তাঁবুতে ফিরিলাম, তখন প্রায় অপরাহ্ণ।

সুরথবাবু বলিয়া উঠিলেন—আমাদের আর একবার খাবার সময় হয়ে এলো যে গুপ্ত-সাহেব! আপনার একী অসম্ভব দেরী!!

সুনন্দা পাশে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—এই রকমই হয়ত রোজ হয়! সহ্য হয়ে গেছে।

হাসিয়া বলিলাম—কতক্ষণ এসেছেন সব? হ্যাঁ, প্রায়ই এই রকম দেরী হয়।

সুনন্দা বলিল—তারপর? রান্নার তো কোন চিহ্নই দেখছি না। এইবার কি রাঁধতে আরম্ভ করবে?

বলিলাম—ভগবানের রাজ্যে তাঁর প্রজার জন্যে সকল রকম ব্যবস্থাই আছে; সুতরাং ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই—রান্না তৈরী হয়ে আছে।

সকালেই স্নান সারিয়া লইয়াছিলাম। মুখ-হাত ধুইয়া, পাশের কুঠ্‌রিতে গিয়া ইক্‌মিক্‌-কুকারটি খুলিয়া বাক্স কয়টি বাহির করিয়া লইলাম। সুনন্দা অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

সুরথবাবু বলিলেন—আপনার কুকারের রান্না খেতে বড্ড লোভ হচ্ছে শৈলেশবাবু। চমৎকার হাইজিনিক্!

হাসিমুখে পাত্রগুলির ঢাকা খুলিতেই মুখ শুকাইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা সুনন্দার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম; চোখোচোখি হইতেই সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

একটা পাত্রের মাংসগুলি যেন চাহিয়া আছে। অন্য পাত্রের চালগুলা বোধ হয় বারকয়েক ফুটিয়া উঠিয়া অর্দ্ধপথেই থামিয়া

গিয়াছে। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনের দিনে রন্ধন-যন্ত্র বিশ্বাসঘাতকতা করিল।

রহিয়া গেলাম।

সমস্ত-কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্ত করিয়া শুধু আপনাকেই অনুভব করিবার অবসর ইহার পূর্ব্বে এমন করিয়া কখনো পাই নাই।

নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত যে-সময়ের প্রয়োজন হইত, সে প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, সেই বিলক্ষণ দীর্ঘ সময়ের কী অপব্যবহারই না আমার হাতে হইয়াছে! নিজের অপটুত্ব এবং অক্ষমতাকে যখন মন্দ নয় বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতাম, তখন জানিতাম না, যথার্থ ভালো করিয়া বাঁচিয়া থাকা কাহাকে বলে। সুনন্দার যত্নের মধ্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই; জীবনের এই যেমন-তেমন-করিয়া-কাটানো এতগুলো দিনের মধ্যে প্রতি পলে অপচয়ের যে ছিদ্র নিরন্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল, আজ তাহার সুপটু হস্তের ব্যঞ্জনায় তাহা ভরাট হইয়া উঠিয়াছে।

এক-এক সময় সুনন্দা ঘরে আসিয়া বলে—ঠিক ক'রে বলো, কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত? কি জানি বাপু, যে চাপা মানুষ তুমি!

হাসিয়া বলি—এই চাপা-মানুষটার সুবিধে-অসুবিধে জগতে আর কেউ না বুঝুক, তুমি যে বোঝ না, তা তোমার নিজের মনকেও বোঝাতে পারবে না। সুতরাং, সে-দিক থেকে নিজে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুধু যদি আমার মুখের দুটো মামুলী বাহবা শুনতে এসে থাকো, তা হ'লে বলছি—আমাকে না ধ'রে আনলেই পারতে।

আয়না-বসানো টেবিলের উপর চিরুণী ব্রস প্র ত সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে সুনন্দা বলিল—থাক্, আ লম্বা-চওড়া বক্তৃতায় কাজ নেই; দেশে গিয়ে যাতে নিন্দে না কর, সেটা আমায় দেখতে হবে ত। তারপর জামা-কাপড়গুলি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিয়া কহিল—আচ্ছা, উনি যখন বারবার আমার নাম ক'রে তোমায় এখানে নিমন্ত্রণ করছিলেন, তখন তুমি আমায় খুব বেহায়া ভাবছিলে, না?

হাসিয়া বলিলাম—পরিচয় লুকিয়ে যখন নিমন্ত্রণ পাঠাচ্ছিলে, তখন তোমার নিজের মনেও এমনি একটা ধারণা নিশ্চয়ই জেগেছিল: সুতরাং এখন আমায় প্রশ্ন করা বাহুল্য।

—তা ত বটেই। আচ্ছা, যখন প্রথম আমায় দেখলে তখন কি মনে হ'ল?

প্রশ্ন কঠিন। তাই উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হইল। বলিলাম—প্রথমটা বিষম বিস্মিত হ'য়ে গিছলাম। তারপর মনে বেশ আনন্দ পেলাম; দূর প্রবাসে একাকী থাকার সময়

পরিচিত প্রিয়-মুখ দেখার যে সহজ আনন্দ, নিছক তাই। তার বেশী কিছু নয়।

অন্যান্য আরও সাধারণ দু'-চার কথার পর সুনন্দা কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল; আমিও Chapter the Last-এর শেষ পরিচ্ছেদ শেষ করিতে বই খুলিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় একাই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম।

আজ যেন এমনি একটা নিভৃত অবকাশের প্রয়োজন আমার ছিল। আজ আর বাহিরের জগতে নয়, ভিতরকার জগতের পরিচিত পথ দিয়াই চলিতে লাগিলাম; তাহারই শোভা-সম্পদ, সেখানকার অধিবাসীবৃন্দের কথাই আজ বারবার আনাগোনা করিতে লাগিল। এই যে আমাকে দূর হইতে অতি নিকটে লইয়া আসা, এই যে আমার সকল সুখ, তুচ্ছতম স্বাচ্ছন্দ্যটির প্রতি এমন তীক্ষ্ণ অতন্দ্র দৃষ্টি,—ইহার অন্তরালে কি আছে, তাহাই জানিবার জন্য আমার মন একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে! ছাত্রাবস্থায় কিছুদিন মনস্তত্ত্ব লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলাম, বাঙলা-সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব-মূলক গ্রন্থরাজীরও অভাব ছিল না,—এই দ্বিবিধলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে যে-বস্তুকে অতি সহজেই আবিষ্কার করিলাম, তাহা যে কেন আজ আমাকে

উদ্বেলিত করিয়া তুলিল না, তাহা নিজের কাছেই অতিশয় বিস্ময়কর লাগিল। অথচ এমন ত ছিল না। এমন দিন ছিল, যখন তাহার নিকট হইতে সামান্যতম আভাসটুকুও আমাকে সারাদিন স্বপ্নমগ্ন করিয়া রাখিত, অহর্নিশি মনের মধ্যে গুঞ্জরণ তুলিত! তবে আজ সহসা মনের এ নিস্পৃহতার কারণ কি? ইহা কি আজন্মার্জ্জিত সংস্কার? না, তাহাও ত নহে। এই ত সেদিনও তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর তাহাকে কি অসম্ভবরূপেই না কল্পনা করিয়াছিলাম!—আমার বাহিরের রক্তচক্ষু ত ভিতরের গোপন-সত্ত্বাটিকে কিছুমাত্র দমিত করিতে পারে নাই।

মনে হইল, সংসারে সকল বস্তুরই জন্ম, বিকাশ এবং ক্ষয় আছে। আমার জাগ্রত যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে প্রেম পূর্ণ বিকশিত হইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল, কালের খরস্রোতে তাহার তীক্ষ্ণতা হয়ত তরঙ্গাহত উপলখণ্ডের মতোই স্থূলধার হইয়া আসিয়াছে,—তাই আজ তাহার দিকে দিকে এমন শ্যামলিমা ঘনাইয়া উঠিয়াছে!

সে যাহাই হোক্, আপাততঃ বহির্জগতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মাথার উপর বোধ করি এতক্ষণ ধরিয়া মহা-সমারোহে আয়োজন চলিতেছিল, লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই; এইবার চারিদিক ঝাপ্‌সা করিয়া শ্রাবণের ধারা নামিয়া আসিল।

যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন নিজের অবস্থা দেখিয়া নিজেরই হাসি পাইতেছিল। সম্মুখের বাহিরের-ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, ভেজানো দরজাটা খুলিয়া দিলাম।

দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া সুরথবাবু বসিয়া আছেন, আর তাঁহারই অপরদিকে আলোর কাছে বসিয়া কি-একটা মোটা বই সম্মুখে লইয়া একটি তরুণী-মেয়ে একটানা সুরে পড়িয়া চলিয়াছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দুইজনের কেহই আমার সাড়া পাইল না।

এখানে আসিবার দুই-একদিনের মধ্যেই জানিতে পারিয়াছিলাম, সুনন্দা ব্যতীত এ-বাড়ীতে আরও একটি মেয়ে আছে। বয়সে সে বোধ করি সুনন্দার ছোটই হইবে; সম্পর্কে সুরথবাবুর ভগ্নী। নাম তাহার মাধবী। আমি তাহাকে কোনদিন চাক্ষুস দেখিতে পাই নাই; হয়ত প্রয়োজন হইত না বলিয়াই সে আমার সম্মুখে বাহির হইত না; কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে যতক্ষণ বাড়ী থাকিতাম, ততক্ষণ তাহার সেই অন্তরালের অস্তিত্বটিকে নিরতিশয় স্পষ্টভাবেই অনুভব করিতাম। আমার জীবন-যাত্রার পথটিকে সুগম করিবার জন্ম সুনন্দার সহিত এই মেয়েটিরও যে যোগ ছিল, তাহা কেহ আমাকে বলিয়া না দিলেও নিঃসংশয়ে বুঝিতাম। আমার কর্ম্ম-শেষের অবকাশটিকে রমণীয় করিয়া তুলিবার জন্ম অন্তরাল হইতে এই মেয়েটির প্রসারিত কল্যাণ-করের স্পর্শ, অমাবস্যার রাত্রে অন্ধকার পৃথিবীর

বুকে সুদূর নক্ষত্রলোকের সুস্নিগ্ধ সহানুভূতির মতো একান্ত করিয়া উপভোগ করিতাম।

অন্তরালের সেই অরূপা কল্যাণীকে আজ বাধাহীন দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া দেখিলাম। নমিতাঙ্গী শ্যামা মেয়েটি। চূর্ণ-কুন্তল-কীর্ণ কপালের নীচে ভুরু-দু'টী প্রসারিত হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। আয়ত স্বচ্ছ চোখ দু'টী যেন দুরবগাহ। বাহিরের অবিরাম বারি-বর্ষণের গুঞ্জন-গীতির মাঝে, মৃদু-আলোকিত ঘরের মধ্যে, পাঠ-নিরতা সেই সাধারণ মেয়েটি আমার চোখে যেন অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী বলিয়া প্রতিভাত হইল।

সহসা তাহার ক্ষীণ আকম্প্র কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া উঠিলাম,—দাদা! শৈলেশবাবু। ওমা: একেবারে নেয়ে গেছেন যে!

ঘরে ঢুকিয়া বলিলাম—হ্যাঁ। এর জন্যে আমিই দায়ী। অনেকক্ষণ থেকে ওয়ার্ণিং দিচ্ছিল, আমিই গ্রাহ্য করি নি। যাই হোক্, এখন এগুলো ছাড়তে পারলে সুবিধে হ'ত।

ক্ষিপ্রপদে মাধবী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুরথবাবু আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—যে-বয়সে বৃষ্টি মাথায় ক'রে বাড়ী না ফিরে পথেই কোথাও আশ্রয় নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়, যদিচ সে-বয়েস এখনো আপনার আসে নি, তবুও আজ এ-ভাবে শরীরকে risk করা আপনার মোটেই উচিত হয় নি।

দিনকয়েক পূর্ব্বে আমার দিন-দুই ধরিয়া জ্বরের মতো হইয়াছিল; বুঝিলাম, কথাটা তিনি সেই সম্পর্কেই বলিলেন।

অনতিকাল পরেই একখানা ধুতি এবং একটা মোটা জামা লইয়া সুনন্দা আসিল এবং আমার এই হঠকারিতার জন্য আমাকে মধুরভাবে যথেষ্ট সস্নেহ তিরস্কার শোনাইয়া দিল।

হাসিয়া বলিলাম—কিন্তু ভিজ্‌তে এতো ভাল লাগছিল! মনে হচ্ছিল, সেই সঙ্গে যেন অনেকদিনের জমা-করা ক্লেদ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। যাক, এখন এক-কাপ গরম চা যদি খাওয়াতে পারো, তা হ'লে তোমায় অনেক ধন্যবাদ দিই।

সুনন্দা ভিতরে চলিয়া গেল। আমি কাপড় ছাড়িয়া, সুরথ-বাবুর বিপরীত দিকে টেবিলের সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই, ধূমোদ্গারী দুই পেয়ালা চা হাঁতে লইয়া মাধবী ঘরে ঢুকিল। তাহার হাত হইতে পেয়ালাটি লইয়া সুরথবাবুকে বলিলাম—আমি আসার আগে আপনাদের নিশ্চয় কিছু পড়াশুনো চল্‌ছিল। তাকে আবার পুনরারম্ভ করা যাক না কেন?

তিনি হাসিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনীটির প্রতি তাকাইলেন; বলিলেন—কোন গভীর ব্যাপার কিছুই নয়। মাধু আমাকে Browning প'ড়ে শোনাচ্ছিল।

আশ্চর্য্য হইয়া মাধবীর দিকে চাহিলাম। ইহাকে ত ঠিক এমন-ভাবে কোনদিনও কল্পনা করিতে পারি নাই; বরং—

বরংকে নিবারণ করিয়া বলিলাম—আমাদের কি সে শোনবার সৌভাগ্য হ'তে পারে না? দেখিলাম, লজ্জায় মাধবী যেন মাটীর সহিত মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে; তাড়াতাড়ি বলিলাম—তা ব'লে আপনাকে কোন অসুবিধের মধ্যে ফেলতে চাই নে; বড্ড সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন, দেখছি।

সুরথবাবু তাহার প্রতি একবার সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন; তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—ওকে আর আপনি ব'লে সম্বোধন করবেন না; তাতে ওর লজ্জা বাড়বে বৈ কম্‌বে না। কি বলিস, মাধু?

মৃদু হাসিয়া টেবিলের উপর হইতে বইখানা হাতে লইয়া বলিলাম—এত কবি থাকতে এঁকেই শেল্‌ফ্‌ থেকে পাড়া হ'ল যে?

সুরথবাবু বলিলেন—উনিই যে আমার ফেভরিট্‌। মাধবীরও।

বলিলাম—এবং আমারও। আশ্চর্য্য বটে!

মিথ্যা বলি নাই। কবিতা অনেক পড়িয়াছি বটে, কিন্তু সেগুলো পড়িয়াছি, কবিতা মনে করিয়াই। অন্তরের অন্তরতম মূর্ত্তির বাণী যাঁহার লেখনী-মুখে উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি—

তিনি এই ইংরাজ-কবি। কবিতার মধ্যে জীবনের এত সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃত উপলব্ধির কথা এমন স্পষ্ট এবং নির্ভীকভাবে শুনাইতে আর কাহাকেও দেখি নাই।

পাতা খুলিয়া, প্রথমেই যে কবিতাটা নজরে পড়িল, পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম—

The rain set early to-night
The sullen wind was soon awake.
It tore the elm-tops down for spite
And did its worst to vex the lake,
I listened with heart fit to break
When glided in Porphyria ...

কবিতাটা পড়িতে সুরু করিয়াই মনে একটু দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছিল—যাহারা শুনিবে, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের কাছে ইহা পাঠ করা সঙ্গত হইবে কি না? কিছুদূর অগ্রসর হইতেই মনের কুণ্ঠা কাটিয়া গেল; বহুবার-পড়া কবিতার পরিচিত লাইনগুলির মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলাম। শেষ লাইন-কয়টি যখন পড়িলাম—

And thus we sit together now
And all night long we have not stirred
And yet God hath not said a word

তখন পড়া শেষ হইবার পর বহুক্ষণ অবধি কেহই কোন কথা খুঁজিয়া পাইলাম না ; বাহিরের অবিশ্রান্ত বর্ষণের মাঝে নিজেদের অন্তরের কথা যেন ডুবিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে স্থরথবাবু বলিয়া উঠিলেন—বাঃ! কী সুন্দর আপনি পড়তে পারেন, শৈলেশবাবু! চমৎকার !! ছবিটাকে যেন এতক্ষণ একেবারে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছিলাম। তারপরেই ভগ্নীকে রেফার্ করিলেন—কি বলিস মাধু, না ?

মাধবীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মাথা কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ; বুঝিলাম আত্মভোলা অগ্রজের এই প্রশ্ন তাহাকে বিব্রত করিয়াছে ; অস্ফুটে কি বলিতে চেষ্টা করিল, বোঝা গেল না।

বলিলাম—এই কাব্যগ্রন্থখানা আমি অনেকবারই পড়েছি ; তাই হয়ত আপনাদের কাছে ভালো ক'রে পড়তে পারলাম।

স্থরথবাবু বলিলেন—কথায় কথায় atmosphereটা নষ্ট করবেন না। আর একটা সুরু করুন।

হাসিয়া আরম্ভ করিলাম—

I send my heart up to thee, all my heart
In this my singing ...

সহসা সুনন্দার তীক্ষ্ণ কলহাস্যে পড়া থামিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম, কখন সবার অগোচরে সে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে। আমি থামিতেই বলিল—বাঃ, বেশ ত আড্ডাটি জমেছে। একা আমিই কেবল ধুঁয়ো আর আগুনের মধ্যে হাঁপিয়ে মরছি।

আর কেউ না চিনুক, সুনন্দাকে চিনিতে আমার বাকী ছিল না; কথাগুলা যত সরলভাবেই সে বলুক, তাহার অন্তর্নিহিত ঝাঁঝটুকু আমার লক্ষ্য এড়াইল না। তাহাকে খুসী করিবার জন্ম তাড়াতাড়ি বলিলাম—শুধু এই আড্ডা জমিয়েই ত রাত কাটবে না; এবং সেই বাস্তবের আয়োজনেই তুমি ব্যস্ত ছিলে। তোমার এ পরার্থপরতাকে এই তুচ্ছ বৈঠকের সঙ্গে তুলনাই করা যেতে পারে না। অচির-ভবিষ্যতের ভার তোমার হাতে তুলে দিইছি বলেই না এমন নিশ্চিন্ত মনে আমরা ব'সে থাকতে পেরেছি; সুতরাং আমাদের এই যে ক্ষণিক আনন্দ, এর জন্তেও তুমিই দায়ী।

সুনন্দা বলিল—থাম বচনবাগীশ; অনেক হয়েছে। এখন এমন জায়গায় এসে পৌছেচি, যেখানে হু'খানা হাতে আর চলে না। আরও হু'খানা হাতের সাহায্য চাই। সেই জন্তেই তোমাদের বিরক্ত করতে আসা।

আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মাধবী উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সুনন্দার নিকটে গিয়া বলিল—আমায় আগেই ডাকলে না কেন বৌদি? ভারী অন্যায় তোমার!

তাহার কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া সুনন্দা আমার প্রতি

চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—কবিতা পড়ার হয়ত ব্যাঘাত ঘটালাম। কিছু মনে কোরো না।

বলিলাম—বিলক্ষণ! ব্যাঘাতের পিছনে যে সুস্বাদু সম্ভাবনা রয়েছে, তাও ত বড় কম নয়।

তাহারা দুইজনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমিও বই বন্ধ করিলাম। সাংসারিক কথা উঠিল; প্রথমে আমার, তারপর সুরথবাবুর। ক্রমে মাধবীর কথা উঠিল। সুরথবাবু বলিলেন—ঠিক নিজের ছোট বোনের মতো ক'রেই ওকে মানুষ করেছি। শিক্ষা-দীক্ষায়, বিদ্যা-বুদ্ধিতে ওকে কারুর চেয়ে ছোট ক'রে তৈরী করি নি। কিন্তু তবুও ওকে যে কেমন ক'রে মনোমত পাত্রে বিবাহ দিয়ে সংসারী করব, তা কিছুতেই ভেবে পাই নে শৈলেশবাবু।

বোধ করি তাঁহার কথা আমার মুখে-চোখে যে বিপুল বিস্ময় জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহা তিনি লক্ষ্য করিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন—আপনাকে আজো কিছু জানানো হয় নি, তাই আপনি অবাক হয়ে গেছেন। হবারই কথা। মাধবী আমার সম্পর্কে কেউ হয় না। ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। এই বলিয়া ধীরে ধীরে মাধবীর জীবনের পাতাগুলি আমার সম্মুখে মেলিয়া ধরিলেন।

যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

তাঁহাদের গ্রামে এক দরিদ্র পরিবার বাস করিত। স্বামী

এবং স্ত্রী। স্বামীর পূর্ব্বপুরুষের অবস্থা হয়ত এককালে ভালই ছিল; এখন কিন্তু অভাব-অনাটনে তাহা তাহার জীর্ণ বাড়ীটির মতোই করুণ হইয়া উঠিয়াছিল। অস্বচ্ছলতাকে কেন্দ্র করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে প্রত্যহই তুমুল বিবাদ বাধিত; এমত অবস্থায় বিবাহ করা যে তাহার অত্যন্ত লজ্জার কাজ হইয়াছে, তাহা স্ত্রী স্বামীকে প্রত্যহই শুনাইয়া দিতেন। শুনিতে শুনিতে একদিন রাত্রি-শেষে বার-দুই ভেদ বমির পর স্বামী চক্ষু বুজিলেন; এবং তাহার পরদিন হইতে স্ত্রীকেও সে গ্রামের মধ্যে কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। দুইজনে দুইদিকে প্রস্থান করিল—রহিল শুধু তাহাদেরই কীর্ত্তি-গাথা বুকে আঁকিয়া—তিন বছরের একটি মেয়ে। সুরথবাবুর মা তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া দাসীদের জিম্মায় রাখিলেন। সেই হইতেই মাধবী সুরথবাবুর কাছে মানুষ হইয়াছে।

কাহিনী শেষ করিয়া তিনি বলিলেন—যতই কেন না ওকে আপনার মতো ক'রে দেখি, পরের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ স্থাপনের বেলায় এ-কথা ত চেপে রাখতে পারি নে। তাই, এ-সব শুনে আজ পর্য্যন্ত কেউ-ই ওকে গ্রহণ করতে রাজী হয় নি। অমন সর্ব্বসুলক্ষণা মেয়ের কপালে কি দোষে যে ভগবান এত বড় অভিশাপ এঁকে দিলেন, তা কিছুতেই ভেবে পাই না।

সুরথবাবুর শেষ কথায় আমার হাসি আসিল। কতকগুলা অন্ধ-আচারের অধীন হইয়া মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি যে বিচার-

বুদ্ধিহীন অপমান আমরা প্রতিনিয়ত নিক্ষেপ করি, সে ত আমাদের নিজের হাতে তুলিয়া দেওয়া ক্ষমাহীন বিধান,—তাহার মধ্যে ভগবানের হাতের স্পর্শ ত কোথাও এতটুকুও দেখিতে পাই না!

উদ্ধত-কথাটা চাপিয়া গিয়া প্রশ্ন করিলাম—মাধবী তার জীবনের এ-সব কথা জানে?

—হ্যাঁ। মা মারা যাবার পর ওকে সমস্তই বলতে হয়েছে।

সে-রাত্রে আহারাদির পর বহুক্ষণ অবধি মাধবীর কথা মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে লাগিল। অর্দ্ধস্ফুট রজনীগন্ধার মতো নিষ্কলঙ্ক এই যে মেয়েটি, ভবিষ্যতে হয়ত সারাজীবন ইহাকে পথ অতিক্রম করিতে হইবে—এক সীমাহীন বিদগ্ধ মরু-প্রান্তরের মধ্য দিয়া, যেথায় না আছে আকাশের এতটুকু বর্ণরাগ, না আছে সার্থকতার এক ফোঁটা তৃপ্তি! এই যে কোমল নমনীয় পুষ্পটি রুক্ষ মরুতাপে ঝলসিয়া মরিয়া যাইবে, তাহার জন্য এতটুকু পাপও কি এ সংসারে কাহাকেও স্পর্শিবে না? মনে হইয়াছিল, সুরথ-বাবুকে বলি—যাহারা নিজেদের পুঞ্জীকৃত দুষ্কৃতির ভার ইহার উপর চাপাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল, তাহাদের কৃতকর্ম্মের জন্য ক্লেদকলুষ-হীন ইহার জীবনকে নষ্ট করিব কোন্ অপরাধে এবং নিজেদের কোন্ শুভ-বুদ্ধির প্রেরণায়? যাহার জন্য সে নিজে এতটুকুও দায়ী নয়, তাহার জীবনের সেই অবাঞ্ছিত দিক্‌টাকেই

চিরকাল বড় করিয়া দেখিব, আর যে আজ এতদিন ধরিয়া শোভায় সম্পদে নিজের জীবনকে অপার্থিব মহিমায় সমুন্নত করিয়া তুলিল, তাহার সেই নব-জাগ্রত নারীত্বকে সম্মানের আসন পাতিয়া দিবার স্থান কি সমাজের কোথাও এতটুকুও খুঁজিয়া পাইব না?

মন্থর গতিতে সময়ের চাকা ঘুরিয়া চলিয়াছে; তাহারই সহিত আমার নির্ব্বিকল্প দিনগুলা। গতকালের সহিত আগামী কালের যে কোন প্রভেদ থাকিবে না, এই সহজ-সত্য যেন গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যহ সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, মাথার শিয়রের জানালার বাহিরে কোন্ অদৃশ্য বৃক্ষ-নীড় হইতে পক্ষী-শাবকদের পরিচিত কল-কাকলী শুনিতে পাই। বিছানা হইতে উঠিয়াই সম্মুখের দেওয়ালে-টাঙানো ছবিখানির উপর প্রত্যহ-ই দৃষ্টি পড়ে;—প্রার্থনারতা মেয়েটির মুখের অভিব্যঞ্জনার কোথাও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ পরেই চা ও জলখাবার হাতে তেমনি ভাবহীন মুখ লইয়া মাধবী প্রত্যহ ঘরে প্রবেশ করে; প্রত্যহই আমার অজস্র প্রশ্নের উত্তরে তাহার সেই স্বল্পবাক্ উত্তরগুলি কোনদিনও এতটুকুও দীর্ঘতর হয় না। আমার দিক হইতে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সকল চেষ্টাকে সে যেন দুই হাত দিয়া বহুদূরে সরাইয়া দেয়। একান্ত

নিকটে পাইয়াও মনে হয়, সে যেন কোন্ এক অনধিগম্য-রাজ্যের প্রাণী, যেখানে পৌঁছানো আমার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়। তাহার অন্তরের এই সঙ্কুচিতা বৈরাগিণীকে আমি চিনি; তাই তাহাকে ভুল বুঝিয়া দোষারোপ করি না। তাহার সুমিষ্ট ব্যবহারটুকুকে সম্ভ্রম করিয়া চলি।

সহসা আমাদের জীবনের এই সুনিয়ন্ত্রিত এবং বৈচিত্র্যহীন স্রোতের মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল, এবং তাহা প্রকাশ পাইল— সুনন্দার ব্যবহারে। তাহার দৃষ্টি যেন আজকাল বিশেষ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে; মাধবীর প্রতি তাহার নিত্যকার আচরণ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে।

সেদিন দ্বিপ্রহরের সুদীর্ঘ অবকাশকে কেমন করিয়া কাটাইব ভাবিতেছি, দ্বারের মুখে দৃষ্টি পড়িতে দেখিলাম, মাধবী ঘরে প্রবেশ করিতেছে। এমন সময় কী কাজে সে আমার কাছে আসিতে পারে তাহা ভাবিয়া পাইলাম না; বিছানা হইতে উঠিয়া বসিয়া তাহার পানে সপ্রশ্ন নয়নে তাকাইলাম।

হাতের গ্লাসটি তেপায়ার উপর নামাইয়া রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে মাধবী বলিল—বৌদি আমের সরবৎ করেছেন; পাঠিয়ে দিলেন।

বটে ? তাই নাকি,—বলিয়া উঠিয়া আসিয়া গ্লাস্‌টা মুখের কাছে ধরিয়া বলিলাম—বাঃ, কি মিষ্টি গন্ধই বেরিয়েছে ! সুরথ-বাবু ফিরেছেন নাকি ?

—না, দাদা এখনো আসেন নি।

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে ?

উত্তর আসিল—না, এইবার হবে।

বলিলাম—সুরথবাবুর কাছে শুনছিলাম, তোমার নাকি বই পড়বার খুব আগ্রহ। আমার কাছে কতকগুলো বই আছে ; দেখো, ওর মধ্যে যদি কিছু নিজের কাজে লাগাতে পারো।

আচ্ছা, বলিয়া মাধবী দরজার দিকে পা বাড়াইল।

ইহার পর তাহাকে আর কি কি প্রশ্ন করিয়া আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহাই ভাবিতেছিলাম ; সহসা বলিলাম—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। আচ্ছা মাধবী, তুমি কি আমাকে ভয় করো ?

দুই চোখ মেলিয়া মাধবী বলিল—এমন প্রশ্ন কেন করছেন ?

বলিলাম—কথাটা তোমাকে অনেকদিন ধ'রেই বলব মনে করছিলাম। আমি দেখেছি, তুমি প্রাণপণ চেষ্টায় আমার কাছ থেকে দূরে স'রে থাকতে চাও। আমার প্রতি তোমার এ অহেতুক ত্রাসের কি কোন কারণ আছে ?

আমার সহিত দৃষ্টি মিলিত হইতেই মাধবী তাহার চোখ দু'টী

নামাইয়া লইল; মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল, তারপর অস্ফুট-স্বরে বলিল—আপনাকে ত ভয় করি না।

বলিলাম—তা হ'লে—

অসমাপ্ত কথার মাঝেই সুনন্দা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার আমার প্রতি, আর একবার মাধবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া হাসিয়া বলিল—ওগো মেম-সাহেব! ডেকে ডেকে যে সাড়াই পাওয়া যায় না। ভজুয়াকে খেতে দিতে হবে না? এটুকু কাজও কি তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারি না?

চাহিয়া দেখিলাম, মাধবীর সমস্ত মুখ হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে রক্তের শেষ-বিন্দুটি পর্য্যন্ত কে যেন শুষিয়া লইয়াছে! ধীরে ধীরে সে দ্বারের বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া বলিলাম—সহসা কোন্ অপরাধে যে মাধবী মেমসাহেব বলে' অভিহিত হ'ল, তা ত বুঝলাম না! ডেকে সাড়া না পেলেই কি মানুষ মেমসাহেব হয়ে ওঠে নাকি?

হাসিতে হাসিতেই সুনন্দা বলিল—মেমসাহেব নয়? পুরুষদের সঙ্গে বসে' ইংরেজী পত্র পড়ে, মিসনরী স্কুলে গিয়ে সাহেবদের সঙ্গে একলা দাঁড়িয়ে কথা কয়, সেমিজ, ব্লাউজ, জুতো ছাড়া একদণ্ড চলে না,—এসব বিবিয়ানা নয়ত কি?

হাসিয়া বলিলাম—হঠাৎ তুমি যে কবে এত বড় গোঁড়া হিন্দু

হয়ে উঠ্‌লে, তা ত জানি না। দরকার হলে ও-সব ত তুমিও পারো।

সুনন্দা বলিল—থাক্, আর চাটুবৃত্তিতে কাজ নেই। আমি কি পারি-না-পারি তা মহাশয়ের যে বিলক্ষণ জানা আছে, তা আমি জানি।

তাহার কথার ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিলাম। উত্তরে একটা কথা মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা বলা সমীচীন হইবে কিনা ভাবিতে ভাবিতে হাতের বইখানা নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম।

বইখানার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সুনন্দা বলিল—কবিতার বই বোধ হয়। এতক্ষণ পড়ছিলে বুঝি? পড় না একটু শুনি। এই বলিয়া সম্মুখের সোফার উপর আধ-শোয়া অবস্থায় বসিয়া পড়িল।

তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলাম—কবিতার বই বটে, তবে এতক্ষণ যে পড়ছিলাম, তোমার এ অনুমান ভুল। কিন্তু এখন তোমাকে কাছে পেয়ে আর কবিতা প'ড়ে সময়টা নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না।

আমার কথা কানে যাইবামাত্র সুনন্দা উঠিয়া বসিয়া তাহার দুই চোখ বড়ো করিয়া আমার পানে চাহিল। বলিলাম—ভয় পেয়ো না। বলছি যে, তোমার মুখের গল্প শুনতে আমার ভারী ভাল লাগে। মনে নেই, ছোট-বেলায় তোমায় একদিন বলেছিলাম যে, তোমার মুখের গল্প শুনতে শুনতে আমি সারা-জীবন কাটিয়ে দিতে পারি?

সুনন্দার মুখের চকিত ভাব ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া গেল ; ঠোঁটের দুই কোণে স্বল্প একটু চাপা হাসি যেন উঁকি দিয়া মিলাইয়া গেল ; পরক্ষণেই সে বলিল—আমার কাছে কবিতা না-হয় নাই পড়লে, তার জন্যে অত অছিলা ত তোমার কাছে চাই নি। পুরাকালে কবে আমায় কি বলেছিলে, তা মনে ক'রে রাখবার মতো অপর্য্যাপ্ত স্মরণশক্তি আমার নেই।

এতক্ষণে তাহার ক্রোধের হেতুটা আমার কাছে স্বচ্ছ হইয়া গেল। বিস্মিত হইলাম, এবং সেই সঙ্গে একটা কৌতুকও অনুভব করিলাম। বলিলাম—যাক্। আর রাগারাগি ক'রে কাজ নেই। শীঘ্রই এইবার আমায় রওনা হ'তে হবে, সুতরাং যাবার আগের দিনগুলো আর ঝগড়ায় তেতো ক'রে তুলো না। এ-ক'দিন আমার জন্যে যা করলে তুমি, তোমার সে অপরিশোধ্য ঋণের কথা চিরদিন আমি মনে করব। তোমার যত্ন—

কথা শেষ হইল না ; সুনন্দা প্রশ্ন করিল—কবে যেতে হবে ?

—তার ঠিক নেই। হুকুম এলেই ষ্টার্ট্ করতে হবে।

—এরপর কি কলকাতায় ফিরবে ? না, অন্য কোথাও ?

—প্রথমে কলকাতায় যাবো। তারপর সেখান থেকে হুকুম হ'লেই আবার নতুন জায়গায় রওনা হ'তে হবে।

—এ-কাজের এই কি চিরদিনের ধারা ?—এমনি ক'রে এখান-থেকে-ওখান, এই ক'রে বেড়ানো ?

—হ্যাঁ। আমার যা কাজ, তার এই চিরদিনের ধারা; এমনি ক'রে এখান-থেকে-ওখান, এই ক'রে বেড়ানো।

—তা হ'লে চিরকাল এমনি ঘুরে-ঘুরেই বেড়াবে?—সংসারী হ'তে হবে না?

হাসিয়া বলিলাম—দরকার কি। এই ত বেশ আছি।

—তা আছো। কিন্তু কী অলীক আকাশ-কুসুম রচনা ক'রেই দিন কাটাতে পারো তোমরা! আশ্চর্য্য হয়ে যাই তাই ভেবে। যা কোনদিন পাও নি, হয়ত পাবেও না কোন-দিন—তাকেই একেবারে আপনার ক'রে নিয়ে খুসীর স্বর্গ তৈরী করো। যা তোমরা নও, নিজেদের অনুক্ষণ তোমরা তাই ভাবো।

সুনন্দার উত্তপ্ত কথার ধারা কোন পথ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহা বুঝিতে আমার একতিলও বিলম্ব হইল না; বলিলাম—কথাটা তোমার ঠিক। কবি বলেছেন—We pine for what is not; ওটা পুরুষের প্রাণ-ধর্ম্ম। তার মন থেকে idealism-এর এই অনুভূতি যখন মুছে যাবে, তখন জগতের সমস্ত রস এবং কাব্যের উৎস বাষ্প হয়ে উবে যাবে।

সুনন্দা বলিল—ছাই অনুভূতি! ও ত কেবল ফাঁকি দিয়ে মানুষের মন গলানোর ফন্দী। নিজেরাও ঠকে, পরের চোখেও ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়।

ইহার উত্তরে কোন কথা বলিতে গেলে তর্ক ব্যক্তিগত

আলোচনায় পরিণত হইবার সম্ভাবনা; কাজেই চুপ করিয়াই রহিলাম। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল।

সহসা সুনন্দা বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, রমেন-দা'কে চেন ত?

প্রশ্ন শুনিয়া মুখ তুলিলাম; বলিলাম—কোন্ রমেন-দার কথা বলছ? তোমার মামাতো ভাই?

—হাঁ। রমেন-দা আরও পাঁচটা নেই। ছেলেবেলার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু দু'জনে একসঙ্গে দু'বছর বিলাতে কাটালে, আর এখন চিনতেই এত দেরী হচ্ছে!

মনে পড়িয়া গেল। বলিলাম—কিন্তু দু'জনে একসঙ্গে দু'বছর কেন, দু'দিনও কাটাই নি সেখানে! সে থাকতো লণ্ডনে আর আমি থাকতাম গ্লাস্‌গোয়। দুটো স্থানের ব্যবধান বড়ো কম নয়। তবে হ্যাঁ, ল্যাণ্ড্‌লেডীর মেয়ের সঙ্গে লণ্ডনে বেড়াতে এলেই তার সঙ্গে দেখা করতাম বটে। শুনলাম, সে নাকি ডেন্‌টিষ্ট্ হয়ে ফিরে এসেছে?

আমার শেষ-প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া আপন-মনেই সুনন্দা বলিল—ও, সে বুঝি ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে! তার কথাই জানতে চাইছিলাম। তা, এখনো তাকে খরচ পাঠাতে হয় ত? কত ক'রে পাঠাও?

সহসা তাহার প্রশ্নে বিমূঢ় হইয়া গেলাম। বলিলাম—তার মানে?

—মানে বোঝা কি এতই শক্ত? রমেন-দার কাছে সব

শুনেছি। তিনি ফিরে এসেই আমাদের কাছে সব কথা বলে' দেন। তুমি ত সেই মেয়েটিকেই—। কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না; বোধ করি বা প্রগাঢ় লজ্জায় তাহার চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

সহসা আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায় এই নিদারুণ মিথ্যা কথায় কিছুক্ষণের জন্য আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। রমেনকে আমার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলিয়াই জানিতাম। অবলীলা-ক্রমে এতবড় একটা মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া তাহার যে কী ইষ্টসিদ্ধি হইল, তাহা ত ভাবিয়া পাই না। হয়ত কোন গূঢ় দুরভিসন্ধি লইয়া সে এ কাজ করে নাই; হয়ত ইহা তাহার নিছক মস্তিষ্কহীনতার পরিচয়। তা সে যাহাই হোক, ক্ষতি যা হইবার তাহা ত হইয়াছিলই।

মুখ তুলিয়া দেখিলাম—সুনন্দা বাহির হইয়া যাইতেছে। একবার ভাবিলাম, তাহাকে ডাকিয়া তাহার মন হইতে এই জঘন্য ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত করিয়া দিই। পরক্ষণেই মনে হইল, কিন্তু তাহার কাছে আমার এই সাফাই-এর আজ কি আর কোন প্রয়োজন আছে? তাহার সমক্ষে নিজের কৈফিয়তের ভারে শুধু কি নিজের দুর্ব্বলতার বোঝাই ভারী করিয়া তুলিব না?

সুনন্দা প্রস্থান করিল, সম্পূর্ণ এক নূতন চিন্তা-তরঙ্গে আমাকে ডুবাইয়া দিয়া; আর আমি বসিয়া রহিলাম, সেই তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সমুদ্রের গভীরতা পরিমাণ করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়া।

পূর্ব্বাপর

সহসা মনে হইল—নিজেকে যে এতখানি বিপর্য্যস্ত মনে করিতেছি, তাহা হয়ত নিছক কোন কাল্পনিক ক্ষতির আঘাত স্মরণ করিয়াই। রমেন যাহা করিয়াছে, তাহা কি সত্যই আমার জীবনে বিশেষ কোন অপরিপূরণীয় ক্ষতি বহন করিয়া আনিয়াছে? নিজের অন্তরের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কৈ, সেখানে কোন গভীর বেদনার স্থায়ী নিদর্শন ত খুঁজিয়া পাইলাম না! মনে হইল—আমার সম্বন্ধে রমেনের মিথ্যাকথা সুদূর অতীতে যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, তাহাই হয়ত নিজেরই অজ্ঞাতে অচির ভবিষ্যতের বৃহত্তর ইষ্টের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে! সংসারে এমনি ত কতই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ যাহা চরম অভিশাপের কাঁটা হইয়া অহরহ প্রতি অঙ্গে বিঁধিতেছে, কাল তাহাই হয়ত সবার অলক্ষ্যে পরম সাধনার ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে!

মনের মধ্যে এক অকল্পিত স্নিগ্ধতা অনুভব করিতে লাগিলাম। বোধ হইল যেন, নব-বসন্তের প্রথম দক্ষিণ-বায়ে অন্তরের অন্তস্থল হইতে বহুদিনের জর্জ্জরিত জীর্ণ পত্রগুলি উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেদিন দ্বিপ্রহরের পরই বাড়ি ফিরিলাম।

ঘরে ঢুকিতে গিয়া বাধা পাইলাম। ভিতরে আমার

বই-এর আলমারিটা খোলা; এবং তাহারই সম্মুখে বসিয়া মাধবী একমনে বোধ করি বইগুলিই নাড়া-চাড়া করিয়া দেখিতেছে। মেঘের মতো ঘনচুল তাহার পিঠ ছাইয়া পড়িয়াছে। গায়ের কাপড় বিস্রস্ত।

দৃশ্যটি মনের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় রাগরেখার সৃষ্টি করিল। মনে হইল যেন বিশ্বমানবের প্রতীকরূপে, যুগ যুগ ধরিয়া এই ছবিই আমি কল্পনা করিয়া আসিতেছি,—নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের এমনিতর মায়া-মোহ, কর্ম্ম-শ্রান্ত পুরুষের এমনি অসময়ে গৃহাগমন, ঘরের ভিতর মঞ্জুভাষিণী প্রিয়তমার এমনি অকুণ্ঠ ভঙ্গী—

স্বপ্ন ভাঙিল, যখন দেখিলাম ত্রস্তা মাধবী উঠিয়া দ্বার-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; দরজার মুখ বন্ধ করিয়া আমার দাঁড়াইয়া থাকার দরুণ বাহিরে আসিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

বলিলাম—আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ঐ বইগুলো দেখছিলে বলে' লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। বইগুলো আর-কেউ যত্ন ক'রে দেখছে বা তাদের কদর বুঝ্‌ছে—এ জেনে আমার আনন্দ হওয়াই উচিৎ। যাই হোক্‌, উপস্থিত আমি বড়ো তৃষ্ণার্ত্ত। সুনন্দাকে গিয়ে বলো, আমায় একটু সরবৎ কিম্বা ওই গোছের কিছু—

কথা শেষ করিবার আগেই মাধবী ঘর হইতে বাহির

হইয়া গেল। জামা-কাপড় ছাড়িয়া সোজা বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। এমন পরিপাটি করিয়া শয্যা রচনা করিতে সুনন্দার আর যুড়ি পাইলাম না ; শ্রান্তি যেন নিজেই তাহার উপর অলস হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। দেখিলাম—আজ যেন ঘরের সাজ-সজ্জারও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করা হইয়াছে। সামান্য-কিছু-অদল-বদল করিয়া ঘরখানিকে নূতন করিয়া সাজানোর ভিতর একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় পাইলাম। এক-একজন এমন মানুষ থাকে, যাহার হাতের স্পর্শে সকল বস্তুই সৌন্দর্য্যের তীরে গিয়া উত্তীর্ণ হয় ; সুনন্দা সেই রকম নারী।

মিনিট দশেক পরে একটা বড় কাঁচের গ্লাস্ হাতে লইয়া যখন মাধবী ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সত্যই একটু বিস্মিত হইলাম। সহসা সুনন্দা এতখানি উদার হইয়া উঠিল কেমন করিয়া ?

মাধবীর হাত হইতে গ্লাসটি লইয়া বলিলাম—আজকের সরবৎটাও ঠিক সেদিনকার মতো হয়েছে! সুনন্দা কি করছে ?

মৃদুকণ্ঠে মাধবী বলিল—বৌদি বাড়ীতে নেই। দাদার বন্ধু ব্রজেনবাবুর মেয়ের আজ বিয়ে কি না, তাই সেখানে গিয়েছেন।

—কখন গেছে ?

পূর্ব্বাপর

—ভোরবেলা। আপনি বেরিয়ে যাবার পরেই।

ইহার পর আর, কি জানি কেন, বলিবার মতো কোন কথাই খুঁজিয়া পাইলাম না। কল্পনায় যাহা স্মরণ করিয়া আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠি, বাস্তবের মাঝে তাহাকেই যখন পাই, তখন আমাদের অসহায়তার আর সীমা থাকে না,—মানুষের অন্তর বাহিরের এমনিই প্রভেদ! সারাক্ষণ কেবলই মনে হইতে লাগিল, আজ এই প্রকাণ্ড বাড়ীটায় শুধু আমরা দুইজন আছি; এই বাড়ীর বাহিরে আর একটা জগৎ বলিয়া কোন কিছুই নাই; এই জনহীন জগতে আমরা দুইটি প্রাণী যেন নীড় বাঁধিয়া যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বসবাস করিতেছি! স্নান-আহার শেষ করিয়া যখন নিজের শয্যার উপর আসিয়া বসিলাম, তখন আমার নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব আনন্দ-রাগিণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে! আজিকার এই অমৃত-স্বাদী অন্ন-ব্যঞ্জন, এই শুভ্র-শয্যা, ঘরের মধ্যেকার তুচ্ছতম বস্তুটি পর্য্যন্ত যাহার হাতের স্পর্শে এমন রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই সুদূর-চারিণীকে আজ যেন নূতন করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার এই মৌনকে মাধবী কি ভাবে গ্রহণ করিল জানি না, কিন্তু দেখিলাম, আজ একটি দিনের জন্য সে যে অধিকার লাভ করিয়াছে তাহার ব্যবহারে তাহার কোন সঙ্কোচ নাই, অনভ্যস্ততার কোন ত্রুটি নাই; একান্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই সে তাহার সকল কর্ম্ম সমাপন করিল।

পূর্ব্বাপর

কোমল বিছানার উপর গা মেলিয়া দিতেই দুই চোখ মুদ্রিত হইয়া আসিল। সর্ব্বদেহ কী এক বিপুল আবেশে মগ্ন হইয়া গেল। শিথিল মন বহুক্ষণ অবধি পাশের কক্ষে কর্ম্মনিরত লঘুছন্দা মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুনন্দার মধ্যে একটা রুদ্র অস্থিরতা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। যাহাকে চিরদিন করুণার পাত্ররূপেই দেখিয়া আসিয়াছি, সেই যখন আমার সম্পদটিকে জয় করিয়া লইবার উপক্রম করে তখন নিজের গর্ব্ব, নিজের পৌরুষ রক্ষা করিবার জন্য মানুষের আত্মঘাতী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময় মনের মধ্যে যে ভাব উপস্থিত হয়, সুনন্দার ব্যবহারে যেন সেই উগ্রতাকে প্রত্যক্ষ করিলাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সুরথবাবুর পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—ভ্রাতা-ভগ্নীতে মিলিয়া একাগ্র-চিত্তে কিসের আলোচনায় মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। সময় পাইলেই, সন্ধ্যার পর এই কক্ষের এই ক্ষণটুকু আমায় আকর্ষণ করিত; এবং সুরথ-বাবুর সহিত যখন নানা বিষয়ের আলোচনায় যোগদান করিতাম, তখন প্রায় সকল সময়েই মাধবীও সেখানে উপস্থিত থাকিত। ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম—আজকের সভায় কা'কে উপস্থিত করা হয়েছে?

সুরথবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—শোপেন্‌হাওয়ার। মাধবী আজ বড় একগুঁয়ের মতো তর্ক করছে। Essays on Womenকে মাধবী কিছুতেই নিরপেক্ষ প্রবন্ধ বলে' বিবেচনা করতে চাইছে না।

হাসিয়া বলিলাম—কেন ?

—ও বল্‌ছে, ভিনিসীয় মেয়েটি তাঁকে প্রত্যাখ্যান ক'রে যদি না বায়রণকে গ্রহণ করত, তা হ'লে কখনই Essays on Women লেখা হ'ত না; সুতরাং ওর পশ্চাতে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে, এবং সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষের প্রেরণায় লেখা যে প্রবন্ধ তাকে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা যেতেই পারে না।

একবার মাধবীর দিকে চাহিয়া সুরথবাবুকে বলিলাম—এর উত্তরে আপনার কি বলবার আছে, শুনি ?

তিনি হাসিয়া বলিলেন—ওঃ, আপনিও ঐ দলে! তা হ'লে ও-আলোচনা আজ মুলতুবী থাক্; বরঞ্চ কিছু পড়ুন, শুনি।

মাধবীর দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিলাম—এমন স্পষ্টভাবেই উনি যখন হার স্বীকার করলেন, তখন আর এ আলোচনা না চালানোই ভাল। কী বল ?

মাধবী মাথা নীচু করিয়া বলিল—হার-জিতের জন্যে আমরা কেউ-ই ব্যস্ত হই নি। আপনি না এলেও আলোচনা ওইখানেই শেষ হয়ে যেত।

বলিলাম—তা ত যেতই। কারণ তুমি একাই ত সে-

আলোচনাকে সমাপ্তির পথে টেনে এনেছিলে; সুরথবাবু যে দলবৃদ্ধির কথা বলছিলেন, তার ত কোন প্রয়োজনই হয় নি।

ইহার উত্তরে মাধবী চুপ করিয়াই রহিল এবং সুরথবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—কেমন! এইবার উত্তর দাও!

হাসিয়া বলিলাম—এমন কিছু কথা নয় যে, তার উত্তর দিতেই হবে। যা হোক্, এখন কিছু পড়া যাক। সুরথবাবু, আজ আপনি পড়ুন। এই বলিয়া শেল্‌ফ্‌ হইতে ব্রাউনিংখানা পাড়িয়া তাঁহার হাতে দিলাম।

সুরথবাবু বলিলেন—পাগল হয়েছেন! আপনার অমন সুন্দর পড়ার পর আমি শেষকালে লোক হাসাবো? আপনিই সুরু করুন।

সঙ্গে সঙ্গে মাধবীও নিম্ন কণ্ঠে তাহার দাদার শেষ কথার পুনরাবৃত্তি করিল। ইহার পর আর কথা না বাড়াইয়া আরম্ভ করিলাম—Two in the Campagna!

'আমি যদি তোমার ইচ্ছাটিকে একান্ত আপনার করিয়া লইতে পারিতাম, তোমার দৃষ্টি দিয়া বিশ্বসংসারকে দেখিতে পাইতাম, আপনার হৃদয়ের স্পন্দনটিকে যদি তোমার সাথে মিলাইয়া দিতে পারিতাম, তোমার আত্মার নির্ঝর হইতে যদি আমার তৃষ্ণার বারি সংগ্রহ করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমার জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষাটি চরিতার্থ হইত! কিন্তু না। আমার কামনা ঊর্দ্ধমুখী! আমি তোমার স্পর্শখানিকে নিবিড়-

ভাবে অনুভব করিয়া পরক্ষণেই দূরে সরিয়া যাই; তোমার আত্মার উত্তাপটিকে নিজের হৃদয় দিয়া স্পর্শ করি, তারপরেই সেই পরম-মুহূর্ত্তটি দূরে বহুদূরে সরিয়া যায়! এই এখনিই ত সেই পরম-ক্ষণ হইতে আমি কতদূরে সরিয়া গিয়াছি! কিন্তু, চিরদিন ধরিয়া কি এমনি ছিন্ন-পত্রের ন্যায় বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইব? আমার লক্ষ্যের পথে কোন অচঞ্চল ধ্রুবতারা, বন্ধুর কল্যাণ-কামনার মতো, তাহার আলোক বিকীর্ণ করিবে না?'

পড়া চলিয়াছে, এমন সময় মুখের উপর কাল-বৈশাখীর আভাস লইয়া সুনন্দা ঘরে ঢুকিল। একবার এদিক-ওদিক ঘুরিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। কিয়ৎকাল হয়ত আমার পড়া শুনিল কিম্বা শুনিল না, ঠিক বলিতে পারি না,—তারপরেই উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পড়িতে পড়িতে মনে মনে একটু হাসিলাম। এ পর্য্যন্ত সকল-ক্ষেত্রেই সে মাধবীকে বিধ্বস্ত করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সম্প্রতি, সুরথবাবুকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা দুই জনে যে নব-নির্ম্মিত দুর্গটি গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার ভিতর প্রবেশের কোন পথই সে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না।

পরদিন সকালে বাহির হইবার পূর্ব্বে এক-মুখ হাসি লইয়া

সুনন্দা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—আজ পারো ত একটু সকাল-সকাল ফিরো। বিকেলে একজন নতুন অতিথি আসচে, তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

বলিলাম—তাই নাকি! তা, এর জন্যে আর তাড়াতাড়ি কি? তিনি কি মাত্র এক-রাত্রির অতিথি যে, আলাপ করবার জন্যে আমায় খুব ত্বরায় বাড়ী ফিরতে হবে? জান ত আমার কাজের কী রকম চাপ পড়েছে? তাড়াতাড়ি কি, যখন তিনি আসচেন তখন আলাপ অবিশ্যি হবেই, আজ না-হয় কাল।

কথায় তোমার সঙ্গে কিছুতেই পারলাম না, বলিয়া হাসিতে হাসিতে সুনন্দা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নদীর স্রোত দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই মুখে বাঁধ বাঁধিতে হইবে। কাজের চাপও ছিল যেমনি প্রবল, তাহার দায়িত্বও ছিল তেমনি গুরুতর। সেদিনের মতো কাজ সাঙ্গ করিয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন রাত্রি অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। গেটের ভিতর প্রবেশ করিতেই, বাহিরের-ঘর হইতে অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিয়া কানে প্রবেশ করিল। বুঝিলাম—যাঁহার আসিবার কথা ছিল, তিনি আসিয়াছেন; এবং এতক্ষণে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন।

দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার পরক্ষণেই অভাবিত বিস্ময়ের আতিশয্যে কিছুক্ষণের জন্য বাক্‌রোধ হইয়া গেল। নবাগতের অবস্থাও বোধ করি আমারই মতো হইয়াছিল;

তিনিও কিছুক্ষণ পলক-হীন নেত্রে নির্ব্বাক হইয়া আমার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিলাম—এঁরা সবাই মিলে যুক্তি ক'রে আমাদের দু'জনকে অবাক ক'রে দিয়েছেন! দিন। তাতে আমাদের এই আকস্মিক মিলনের আনন্দ বাড়লো বৈ কমল না। এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার করমর্দ্দন করিলাম।

রমেন এইবার মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—তা ঠিক। কিন্তু এরা বুঝি তোমাকেও আমার আসার কথা কিছু বলে নি। আই সী। আমাকে শুধু বল্‌লে—সন্ধ্যার সময় একজন পরিচিত বন্ধুকে দেখতে পাবেন; কিন্তু আমি কিছুতেই গেস্‌ করতে পারি নি। তারপর খবর কি? এখানে কি সূত্রে?

সূত্রের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। রমেন তখন অনর্গল বকিতে লাগিল—জানেন সুরথবাবু! এই শৈলেশ ছোকরা একেবারে অপদার্থ। বিলেত গেল, কিন্তু সেই যে বই নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বসল—বাস্‌! নড়চড় নেই! না দেখলে—লাইসীয়ামে নতুন নাটকের প্লে, না ভর্ত্তি হ'ল কোন ক্লাবে, না কোথাও সঙ্গিনী নিয়ে এলো বেড়িয়ে! মাঝে মাঝে আসতো বটে লণ্ডনে আমার সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই! আচ্ছা শৈলেশ, কতগুলো ডিগ্রী সঙ্গে ক'রে এনেছিস—দু'টো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা?

তাহার কথার ভঙ্গীতে সুরথবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; সুনন্দাও মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিতে লাগিল। কিন্তু আমার মন সহসা বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মাধবী এতক্ষণ ধরিয়া এখানে বসিয়া আছে কী প্রয়োজনে? বিলাত-প্রত্যাগত অভ্যাগতের মুখের হাল্কা গল্প শুনিবার মোহ কি তাহার মধ্যেও আছে?

শ্রান্তির অজুহাত দিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। রমেনের উপর অন্তরের বিরূপতার আর অবধি রহিল না। মনের মঞ্জুষায় এতদিনের সঞ্চিত মাধুর্য্য এক নিমেষে অপরিসীম তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল।

পরদিন রমেনের সহিত একত্রে আহার করিলাম। মাধবী আমাদের পরিবেশন করিল। কথায় কথায় জানিলাম—রমেন কলিকাতায় এক ফিরিঙ্গী ডাক্তারের সহিত মিলিত হইয়া একটি দাঁতের ডাক্তারখানা খুলিয়াছে, এবং অতি-আধুনিক সভ্যতা বিলাসের কৃপায় তাহাদের চিকিৎসালয়ে রোগীর অভাব হইতেছে না। কয়েকদিনের অবসর লইয়া সে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে।

ইহার পর দুইদিন আমার স্নানাহারের সময় রহিল না। নদীর দুর্ব্বার খর-স্রোতের বিরুদ্ধে মিস্ত্রির দল কিছুতেই বাঁধের শেষ স্তম্ভ গাঁথিতে পারিতেছে না; তাই আমাকে দিন-রাত্রির

প্রায় সকল সময়ই নদীতীরেই অতিবাহিত করিতে হইতেছে। ইহা ভালই হইয়াছে যে, কাজের মধ্যে নিজেকে এমন করিয়া সারাক্ষণ ডুবাইয়া রাখিতে পারিয়াছি। অবাধ্য নদীর দুরন্ত স্রোতের মুখে বাঁধন দেওয়াই আমার কাজ, হৃদয়ের ব্যাপারে অনর্থক মস্তিষ্ক আন্দোলিত করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করা আমার নয়। যে-কয়দিন এমনিই নষ্ট হইয়াছিল, তাহারই ক্ষতি-পূরণের জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিয়া গেলাম।

একাদিক্রমে সুদীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা নদীতীরে কাটাইয়া মিস্ত্রিদের শেষ উপদেশ দিয়া শেষ-রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া এক দীর্ঘ ঘুম দিলাম। পরদিন অধিক বেলায় যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বিরামহীন কর্ম্মের উত্তেজনার পর নির্ব্বিশঙ্ক অবকাশের অবসাদে মন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

রমেন আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল; কহিল—ব্যাপার কি হে? দু'দিন ধ'রে যে চুলের টিকি দেখতে পেল্লাম না! সুনী বলছিল—মাঝে মাঝেই নাকি এই রকম হয়। আচ্ছা কাজ নিয়েছ ত!

হাসিয়া বলিলাম—মেমের দাঁত দেখে পয়সা রোজগারের ভাগ্য ত সবাইকার হয় না ভাই! যার যেমন।

—হ্যাঁ, কী যে বলো তার ঠিক নেই! তোমার সঙ্গে আমার তুলনা! যাই হোক্, কয়েকদিন ভারী চমৎকার কাট্‌লো। আজ বিকেলে চল্‌তি।

পূর্ব্বাপর

—আজই ?

—হ্যাঁ ভাই। তা ছাড়া কোথায় বেশী দিন আমি টিঁকে থাকতে পারি না, জানোই ত আমার স্বভাব।

মনে মনে বলিলাম—তা আর জানি না? কিন্তু তোমার এই আকস্মিক আবির্ভাব এবং তিরোভাবের হেতুটা ত স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

বৈকালে সুরথবাবুর সহিত আমিও ষ্টেশনে গেলাম। গাড়ী আসিবার বিলম্ব ছিল। এক সময় রমেন আমায় একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অন্যান্য পাঁচ কথার পর বলিল—দেখ্ শৈলেশ, এক-একসময় মানুষ হঠাৎ এমন একটা মন্দ কাজ ক'রে ফেলে, যা করবার জন্যে তার মনে এতটুকুও অভিসন্ধি কোনদিন ছিল না ;—এর জন্যে পরে তার যথেষ্ট অনুতাপও হয় ; কিন্তু তবুও অপরাধের একটা গ্লানি তার অন্তরে থেকেই যায় চিরকাল। এ বড় অদ্ভুত। জানিস্, তোর সম্বন্ধেও আমি একদিন এমনি একটা অনর্থক অন্যায় কাজ করেছিলাম। আর তার জন্যে আজো আমার অনুতাপের অন্ত নেই।

সমস্তই বুঝিলাম। তাহার অন্তরের এই অকৃত্রিম ছবিখানি বড়ই সুন্দর লাগিল। তাহার দুই হাত ধরিয়া বলিলাম—আমি সব জানি। আমি সর্ব্বান্তকরণে বলছি, তার জন্যে তোর ওপর আজ আর আমার এতটুকুও রাগ নেই।

—সত্যি বলছিস? আঃ, বাঁচা গেল! ওই যে গাড়ী

আসচে। চিরকাল তুই সেই একই-রকম র'য়ে গেলি, আশ্চর্য্য! এমনি ভাবেই চিরদিন কাটাবি বোধ হয়? এখানে আর কতদিন আছিস? কলকাতায় যাবি কবে?

তাহাকে ট্রেনের কামরায় তুলিয়া দিয়া বলিলাম—কতদিন আছি, ঠিক বলতে পারি না। তবে যাব বোধ হয় শীগ্‌গির। দু'দিন আগে কিম্বা পরে।

—গুড্‌ বাই।

—গুড্‌ বাই।

বাড়ীমুখো হইয়া সুরথবাবু বলিলেন—বেশ প্রাণখোলা ভদ্রলোক। আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। তারপর সহসা প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা, রমেনবাবু কেন এসেছিলেন, আপনি কিছু শোনেন নি?

বলিলাম—না। কেউ না বললে, শুনবো কার কাছে?

উত্তর শুনিয়া তিনি কিছুকাল নীরব রহিলেন; তারপর আপন-মনেই বলিলেন—নাঃ, এখন বোধ হয় আপনাকে বলতে কিছুই আপত্তি থাকতে পারে না। সুনন্দাই চিঠি লিখে ওঁকে আনিয়েছিল—মঞ্জুর সঙ্গে ওঁর বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা করবার জন্যে।

—তাই নাকি? বাঃ, বেশ ত! সব ঠিক হয়ে গেছে?

—না, কৈ আর হ'ল! সুনন্দার খুব ইচ্ছে ছিল, আমারও অমত ছিল না; আর রমেনবাবুও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ

করেছিলেন। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত মাধু বড্ডই বেঁকে বসল, কিছুতেই রাজী হ'ল না! ওর যখন অত আপত্তি, তখন জোর ক'রে ত কিছুই করতে পারি না, কি বলেন?

বলিলাম—তা ত বটেই।

পথে আর বিশেষ কোন কথা হইল না। কথা কহিবার মতো মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। সারা পথ ব্যাপিয়া অন্তরের মধ্যে কী এক অব্যক্ত আনন্দ অপরূপ স্পন্দনের সঞ্চার করিতে লাগিল।

বহুদিন পরে সেদিন সান্ধ্য-ভ্রমণে সুরথবাবুকে সঙ্গী পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। তিনি আমার অপেক্ষায় প্রস্তুত হইয়া গেটের বাহিরে পদচারণা করিতেছিলেন, আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেই বলিলেন—চলুন, আজ এই দিক্‌টাতেই যাওয়া যাক।

চলুন, বলিয়া অগ্রসর হইলাম।

কিছুদূর গিয়া সুরথবাবু বলিলেন—শৈলেশবাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

বলিলাম—তাই নাকি? বলুন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন—যাই হোক,

এ ক'দিন বেশ আমোদেই কাটানো গেল। এতদিন এখানে আছি, কিন্তু আপনার মতো লোক—ইত্যাদি।

ভূমিকার বহর দেখিয়া হাসি পাইল। নীরবে তাঁহার সকল কথায় সায় দিয়া চলিলাম। অনেকক্ষণ অনেক অবান্তর কথার পর বহু দ্বিধা এবং গভীর লজ্জার সহিত তিনি আসল কথাটা প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া বুঝিলাম, উহার জন্য ঠিক অতখানি ভূমিকারই প্রয়োজন ছিল। সুরথবাবুর বাক্যের অন্তরালে যাহার অস্তিত্বকে নিশ্চয় করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম, মনে মনে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম—যদি এ-কথা না বলিয়াই থাকিতে পারিলে না, অনর্থক এই সরল প্রকৃতির লোকটিকে এতখানি অপ্রতিভ করার কী প্রয়োজন ছিল? আজ তোমার এই কথা শুনিয়া আমার বিন্দুমাত্রও ক্ষোভ হইল না, বরং এমন সাধারণ এবং প্রত্যাশিতভাবে নিজেকে যে প্রকাশ করিয়া ফেলিলে, তাহাতে আমার আনন্দই হইল; কিন্তু সোজা কথায় না পারিতে, আভাসে-ইঙ্গিতে নিজেই আমাকে জানাইলেই ত হইত!—এ-ক্ষেত্রে নিজের স্বভাব-ধর্ম্মের একটুকু ব্যতিক্রম করিলে, এই নিরীহ লোকটি অপ্রিয় কার্য্য করিবার দুস্তর লজ্জা হইতে রক্ষা পাইত।

বলিলাম—এই কথা? তার জন্যে আপনি অতখানি 'কিন্তু' হচ্ছেন কেন? আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে; দু'-চারদিনের মধ্যেই আমাকে যেতে হ'ত। সুতরাং সেই দু'-চারদিনকে দু'-

তিনদিন এগিয়ে আনা—আমার পক্ষে কিছুই অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া, আপনারাও যখন কাল-পরশু অন্য কোথাও কিছু দিন ঘুরে আসবেন বলছেন,—তখন আমারও কালকে রওনা হওয়াই দরকার।

দুরূহ কাজটা এমন সহজে সমাপিত হইয়া গেল দেখিয়া সুরথবাবু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বলিয়া ফেলিলেন—দেখুন, এ-কে আমি আজো ঠিক চিনতে পারলাম না। যখন আপনি আসেন নি, তখন আপনাকে এ বাড়ীতে আনাবার জন্যে কি ব্যস্ততা; অথচ আপনি এসে দু'দিন থাক্‌তে-না-থাক্‌তেই—

মনে করিলাম বলি—সংসারে অনেক বস্তুই যখন আজো চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই, তখন নারী-চরিত্রের এই দিক্‌টাও না হয় না-চিনিয়াই রাখিয়া দিলেন; ইহাকে লইয়া গবেষণা করিয়া কোন আনন্দই আহরণ করিতে পারিবেন না।

মুখে বলিলাম—মেয়েরা চিরকালই অমনি অস্থির-মতি। তার জন্যে আপনিও অস্থির হবেন না।

ট্রেনের কামরায় বসিয়া গাড়ী ছাড়িবার অপেক্ষা করিতে-ছিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই ষ্টেশনে আসিয়াছিলাম; কি জানি যদি গাড়ী ফেল হইয়া যায়!

পূর্ব্বাপর

বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম—আকাশ-প্রান্তে কালো মেঘগুলা ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকাইতেছে। দূর হইতে ভিজা বাতাস মন্থর গতিতে ভাসিয়া আসিতেছে। পাখীর দল উর্দ্ধশ্বাসে নীড়ের অভিমুখে পাখা মেলিয়া চলিয়াছে। ঝড় উঠিল বলিয়া।

বাঁশী দিয়া গাড়ী দুলিয়া উঠিল। এমন সময় সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম—আমার চাপরাশিটা আমাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতেছে।

—কি খবর?

-বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। আপনাকে নামতে হবে।

কাজ করিব মুখে বলা, এবং তাহা সত্যকারের করার মধ্যে সংসারে কতই না প্রভেদ! নামিতে হইবে বলিলেই ত নামা যায় না। গাড়ী তখন ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কালের অসীমতার মধ্যে একটা বৎসর সময় হিসাবে যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, মানুষের এই হ্রস্ব জীবনের মাঝে তাহা নিতান্ত কম সময় নয়। সেই বিগত একটি বৎসরের প্রত্যেকটি দিনকে কেমন করিয়া নিজের হাতে হত্যা করিয়া আসিয়াছি শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতেছিলাম, সহসা ঘরের মধ্যে কাহার প্রবেশের সাড়া পাইয়া বলিলাম—কে?

পূর্ব্বাপর

—চিনতে পারবে না।

পরিচিত কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দ্বিগুণ বিস্মিত হইয়া গেলাম। সুনন্দাকে যে আবার কোনদিন এমন করিয়া দেখিতে পাইব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। বলিলাম—তোমাকে চিনতে না পারা হবে আমার চরম দুর্ভাগ্যের দিন। তার এখনো বোধ হয় দেরী আছে। কিন্তু এ ঘোর অকালে আবির্ভাবের হেতু?

উঠিয়া বসিলাম। তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যেন ঈষৎ মোটা হইয়াছে। বেশ-ভূষার অসামান্য পারিপাট্য।

আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়া সুনন্দা বলিয়া উঠিল—কতদিন এমন ক'রে ভুগছ? কাজকর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়েছ না কি? চিঠি লিখেছিলাম, তার উত্তর দাও নি কেন?—

হাসিয়া তাহাকে বাধা দিলাম। বলিলাম—থামো, থামো। প্রশ্নের ভারে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দিতে চাও না কি? প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি; তারপর বলছি।

সুনন্দা ততক্ষণে আমার খাটের একধারে বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—সুরথবাবু ভালো আছেন? কবে কলকাতায় এলে?

—হ্যাঁ, ভালো আছে। মাস দুই। এখন কিছুদিন এইখানেই থাকবো। নতুন কার কিনেছি, লা-সেইল সীডান।

—বাঃ, তাইতে কু'রেই বুঝি একলা এসেছ ?

—না ; হ্যাঁ।

—তার মানে ?

—একলাই এসেছি।

বলিলাম—জেনে-শুনেই যখন এসেছো, তখন অতিথি-সৎকারের ত্রুটি নিও না ; কারণ তোমার মতো এমন অতিথি আমার ঘরে কখনও আসে নি ; তা ছাড়া, তাকে সমাদর করবার উপযুক্ত লোকেরও অভাব।

সুনন্দার ঠোঁটের কোণে একটা অর্দ্ধস্ফুট হাসির রেখা দেখা দিল ; বলিল—আমার প্রশ্নের উত্তর ?

বলিলাম—বিশেষ দেবার কিছু নেই। জ্বর হয়েছে এই কয়েকদিন। কাজকর্ম্ম করবার মতো এনার্জি নেই। অনাবশ্যক-বোধে তোমার চিঠির উত্তর দিই নি। আজ সশরীরে তারই উত্তর নিতে এসেছো না কি ?

সুনন্দা বলিল—তোমার সাহেবের সঙ্গে ওঁর একদিন দেখা হয়েছিল ; সে বললে—সুবর্ণ-ভবিষ্যৎ অগ্রাহ্য ক'রে তুমি নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে' আছ ! একটা খুব বড়ো কাজের ভার পেয়েছিলে ; টাকা আর মান—দুই-ই অনেক ছিল। ছাড়লে কেন ?

আশ্চর্য্য হইলাম। এত খবর ও সংগ্রহ করিল কোথা হইতে ! আইরীশম্যান ওনীল সাহেব যে এত ক্ষ্যাপা ইতিপূর্ব্বে তাহা

জানিতাম না। বলিলাম—বল্‌লাম ত, ভাল লাগে না। কাজে উৎসাহ পাই না। জীবনে অরুচি ধরে' গেছে।

—কার জন্যে এমন হ'ল?—সুনন্দা, না স্যালি, না—?

অসহ্য-বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম—কি বলছ তুমি?

না-থামিয়াই সুনন্দা বলিতে লাগিল—আশ্চর্য্য হয়ে যাই শৈলেশ-দা, জীবনের প্রতি তোমাদের দৃষ্টির এই সঙ্কীর্ণতা দেখে। কাউকে ভালোবেসে না পেলেই তোমাদের জীবন রিক্ত হয়ে যায়; কাজকর্ম্ম ছেড়ে তোমরা একেবারে জগন্নাথ ব'নে যাও। নারীকে শুদ্ধমাত্র ভালবেসে তোমাদের প্রেম সার্থক হয় না, তাকে নিজের অধিকারের মধ্যে একান্ত ক'রে পেলেই তবে তোমরা চরিতার্থ হও। নারীকে ভোগের বস্তু ক'রে পাবার মধ্যেই এই যে তোমাদের জীবনের চরম সার্থকতা—এর মধ্যে কোন বড় আদর্শবাদ নেই। তাদের কাছে তোমরা প্রেরণা চাও না, প্রেম চাও না—চাও শুধু তাদের বাইরের খোলোসটাকে। আর সেই তুচ্ছ জিনিষটাকে না পেলেই তোমরা এক-একজন বড় বড় ব্যর্থ-প্রেমিক হয়ে যাও; সংস্কার-ধর্ম্ম পালনে তোমাদের মুখের বিতৃষ্ণার আর অন্ত থাকে না। ভগবানের দেওয়া এই সুন্দর জীবনের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে অপারক এই সব পঙ্গু-প্রেমিকের এই মনোভাবই আজকালকার মাসিক-পত্রের সব গল্পের মধ্যেই দেখতে পাই; এক রা। এ জীবনে লাভ-অলাভ হার-জিত ত থাকবেই; এ জীবনই ত একটা মস্ত রকমের খেলা; জানো ত

খেলায় হেরে গেলে যারা অসন্তুষ্ট হয়, তারা sportsman নয়। হেরে গেলেই মানুষ কাপুরুষ হয়ে যাবে কেন?

সুনন্দার কথার ঝাঁঝে কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল। পায়ের কাছ হইতে কম্বলখানাকে সরাইয়া দিয়া বলিলাম—বাড়ী ব'য়ে তুমি আজ আমাকে অপমান করতে এসেচো—কিন্তু না জেনে-শুনেই। তুমি জানো না যে, নারীকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধার চোখেই দেখে এসেছি; নারী যে পুরুষকে অসীম শক্তি, অনন্ত প্রেরণা দিতে পারে—তা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। তুমি জানো না যে, আজো আমার মনে সংসার পাতবার সাধ জাগে; আমি স্ত্রী চাই, আমি তৃপ্তি চাই, জীবনের প্রিয়-সঙ্গী-পরিবৃত পথে আমি বড়ো হ'তে চাই—

সহসা মনে হইল—ছিঃ, ছিঃ! এ কী করিতেছি! সস্তা নাটকের অন্তঃসারশূন্য নায়কের মতো এমন য়্যাক্টিং করিতে আমি আবার কবে শিখিলাম; তাহাও আবার এমনি এক উগ্র কঠিন রমণীর সম্মুখে, হৃদয়াবেগ যাহার কাছে নিছক উপহাসের বস্তু?

সুনন্দা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল; আমি নীরব হইলে বলিল—উঠ্‌ছ কোথায়? আমাকে বাড়ীর বার ক'রে দিতে না কি? কিন্তু আমার সব কথা ত এখনো শেষ হয় নি। এই বলিয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কি-একটা বস্তু টানিয়া বাহির করিল; বলিল—দেখ ত, এটা কি?

পূর্ব্বাপর

সবিস্ময়ে বলিলাম—এ কি! এ যে দেখছি, আমার সেই মাফ্‌লারটা, যেটা তোমাদের বাড়ী হারিয়ে গিছল! এটা এত-দিন ছিল কোথায়? তোমার কাছে? ছিঃ, সুনন্দা, শুধু শুধু এটাকে এতদিন তোমার কাছে রাখতে গেলে কেন?

সহসা সুনন্দার তীক্ষ্ণ চটুল হাস্যে আমি অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম; সে বলিল—আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দাও ত। যদি একটি মেয়ে একজন ছেলের একটা পুরনো গলাবন্ধ চুরী ক'রে নিজের কাছে রেখে দেয়, মাঝে মাঝে সেটিকে বার ক'রে দেখে আর চোখের জলটুকু তাই দিয়ে মুছে ফেলে, তা হ'লে কি এই কথাই নিঃসংশয়ে প্রমাণ হ'ল না যে, মেয়েটি ছেলেটিকে সত্যিই খুব ভালোবাসে?

বিরক্ত হইয়া বলিলাম—তোমার কথাগুলো অত্যন্ত নাটকীয় হ'ল—মেলোড্রামার উপযুক্ত।

—নিশ্চয়। কোন্ এক বড়ো দার্শনিক ত বলেইছেন—জীবনই একখণ্ড মেলোড্রামা। কোন মেয়ে তোমাকে এত ভালোবাসে জেনে তোমার আনন্দ হচ্ছে না? আমি হ'লে ত নেচে বেড়াতাম! আচ্ছা, উদয়শঙ্করের নাচ দেখেছ? দেখ নি। জীবনে ফাঁক র'য়ে গেছে। উঃ, তাণ্ডব যখন নাচলে, তখন সত্যি বলছি, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছিল! মাধুটা একেই ভীতু,—সে ত একেবারে—

তাহার এই অহৈতুক প্রগল্‌ভতা, এই অর্থহীন কলহাস্য—

ইহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না; মৌন হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; এখন একটা টুল অধিকার করিয়া বসিয়া বলিল—এ অমূল্য বস্তুটি এতদিন আমার কাছে ছিল না গো, আমার কাছে ছিল না। আচ্ছা, সত্যিই কি কিছু বুঝতে পাচ্ছ না?

স্তব্ধ হইয়া গেলাম। সুনন্দা আজ এ কী পরমাশ্চর্য্য ইঙ্গিত লইয়া আসিল। কথাটা ভাবিতেও সমস্ত মন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ভারে শিথিল হইয়া পড়িল। বলিলাম—তুমি যে কি পাগলের মতো বকছ, সুনন্দা! তোমার ইঙ্গিত সত্যি বলে' মেনে নেওয়া আমার পক্ষে যে কত শক্ত, তা ত তুমিই সব-চেয়ে বেশী জান।

—কিন্তু এ সত্যি। সত্যিই মাধবী তোমাকে ভালোবাসে। নেবে ওকে?

তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মুখের অপরূপ রক্তাভা গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম—যার দূতী হয়ে তুমি আমার কাছে এসেচো তাকে পেলে যে-কোন পুরুষ ধন্য হয়ে যাবে, এ কথা নির্ভয় চিত্তে বলতে পারি। কিন্তু—

—আর কিন্তুতে কাজ নেই। মাধবীকে নিয়ে আসচি। কিন্তুটা যদি পারো, তাকেই বোলো।

—মাধবী? কোথায় সে?

—বাইরে। গাড়িতে।

—বাইরে! ভিতরে আনো নি কেন?

—বিনা অনুমতিতে ভিতরে আসবার অধিকার এতদিন একা আমারই ছিল, বলিয়া সুনন্দা হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাধবী আমাকে ভালবাসে! সেই ভীরু অবলম্বন-প্রয়াসী মাধবী! আমার ব্যবহৃত একটা তুচ্ছ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া সে তাহার নিরুদ্ধ প্রেম আমারই উদ্দেশ্যে উজাড় করিয়া দিয়াছে! একটা সম্পূর্ণ অভিনব অনুভূতির দোলায় সারা মন স্পন্দিত হইতে লাগিল। নিজেকে আজ নূতন করিয়া দেখিলাম। সুনন্দাকে নূতন করিয়া দেখিলাম। মাধবীকে নূতন করিয়া দেখিলাম। সমস্ত জগৎ যেন আজ আমার চোখে নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

দুইজনে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে একেবারে আমার কাছে টানিয়া আনিয়া সুনন্দা বলিল—দেখছিস! তোরই ধ্যানে লোকটা নিজেকে ক্ষয় ক'রে ফেলেছে। এর কি মূল্য দিবি তাই বল্?

মাধবী আরক্ত-মুখে নত-নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল; উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিলাম—ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কোরো মাধবী, কিন্তু আজ আর লজ্জা করবার সময় নেই। যদি এসেচ, তা হ'লে তোমার এই অনারব্ধ গৃহস্থলী নিজের খুসীমতো

সাজিয়ে নাও। এই অসহায় সম্বলহীনের সমস্ত ভার তুমি নাও, মাধবী।

কোন উত্তর পাইলাম না। শুধু আমার দুই হাতের মধ্যে তাহার হাত দুইখানি আর একবার কাঁপিয়া উঠিল। পিছন হইতে সুনন্দা বলিল—নেবে না ত কি! তোমার গলার ফাঁস ও যখন সেধে নিজে পরেছে, তখন আর না নিয়ে যাবে কোথায়?

নিদারুণ লজ্জায় মাধবীর ঘাড় ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহাকে বিছানার উপর বসাইয়া দিয়া বলিলাম—সুনন্দা আজ আমাদের যা-তা ব'লে নিচ্ছে! নিক্। ও সবাইকে জানলে, কিন্তু নিজেকে এতটুকুও জানালে না। ও আমাদের ভাগ্যদেবী। ওর কাছে আমাদের কিছুমাত্র লজ্জা নেই।

তারপর সুনন্দার দিকে ফিরিয়া বলিলাম—সুনন্দা, তোমার গাড়ীখানা একবার বিকেলে দেবে? সেই কাজটার জন্তে একবার ওনীল সাহেবের কাছে—

—তা আমি এখন ঠিক বলতে পারি না। বিকেলে আমার কাজ আছে। বেরুতে হবে। এই বলিয়া সুনন্দা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নাম তার মায়া। সারা কলেজের মধ্যে ছোট-বড় নির্ব্বিশেষে সবাইকার এমন পরম নির্ভর-স্থল তার মতো আর কেউ-ই ছিল না। ছোটদের প্রতি তার ছিল অমিত স্নেহ, বন্ধুদের প্রতি অসীম প্রীতি, বড় যাঁরা তাঁদের প্রতি অবিশ্রান্ত সহকারিতা। তার সমযোগী অন্য মেয়েদের তুলনায় তার মধ্যে অসাধারণ হয়ত কিছুই নেই, কিন্তু তবুও এই অনুক্ষণ পাঁচ-জনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে থাকার মধ্যেই তার চারিপাশে এমন একটি সুদূর একাকীত্ব আছে যা তার একান্ত নিজস্ব বস্তু,—শেষ রাত্রির আকাশে দীপ্যমান তারাটির মতো তার ব্যক্তিত্বের এই সহজ প্রসন্নদীপ্তি দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। কবির ধ্যানের মতো সে যেন আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে ফুটে উঠেছে!

অতি শিশুকাল থেকেই এক স্নেহশীল মামা ভিন্ন সংসারে মায়ার দ্বিতীয় অভিভাবক আর কেউ ছিল না। মায়া যে-কলেজে পড়ে তার মামা সেই কলেজেরই দর্শনের অধ্যাপক,—এবং দর্শনের অধ্যাপক বলতে যা বোঝায়, পুরোপুরি তিনি ছিলেন তাই। সুতরাং মায়া বড় হয়ে উঠেছিল—তার নিজের স্বাধীন সত্তার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামত বিকাশের ভিতর দিয়ে।

তার বয়স যখন ষোলো পার হ'ল, তখন দূর এবং

আত্মীয়বর্গের খোঁচায় সচেতন হয়ে অধ্যাপক-মহাশয় পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করলেন। পাত্র অনেক এলো, কিন্তু তেমন মনোমত কারুকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। মায়া তখন মামাকে এই ব'লে নিবৃত্ত করলে—কেন মামা, তুমি পাঁচজনের কথায় নিজেকে সারাক্ষণ অস্থির করছ; এখন ও-সব থাক। যখন দরকার হবে আমি তোমাকে বলব।

মামা তার আদরের ভাগিনেয়ীটিকে বিলক্ষণ চিনতেন; তাই তার কথা শুনে হৃষ্টচিত্তে পুনরায় তাঁর দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে ডুব দিলেন। মায়ার বিবাহের কথা সেইখানেই চাপা প'ড়ে গেল।

তা গেলেও, তার বন্ধুদের মধ্যে সে কথা নিয়ে যে মাঝে মাঝে আলোচনা হ'ত না, তা নয়। সেদিনও সেই রকমই একটা কথা হচ্ছিল।

ইনার কথায় মায়া সহাস্যে উত্তর দিলে—তোমরা ত বলছ, কিন্তু আমি ত কারুকেই দেখতে পাচ্ছি না।

স্নিগ্ধমুখী সুধা বল্লে—সে কি ভাই! তোমার ভক্তের সংখ্যা দিন দিন যে কি রকম বেড়ে উঠ্ছে তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? তাদের কারুকেই কি তোমার পছন্দ হয় না?

নব-পরিণীতা কৃষ্ণা বল্লে—তোর ক্লাসের নরেশ বোস ত চমৎকার ছেলে। কতদিন ধ'রে তোকে সাধ্য-সাধনা করছে। ওকেই কেন—

মায়া বলে উঠ্‌ল—ওই প্যান্‌পেনে কবি? না ভাই। ওর কবিত্বর জ্বালায় এখনই অস্থির হয়ে উঠেছি, এরপর তা হ'লে একদিনও রাত্রে ঘুমুতে দেবে না।

ইনা বল্লে—বেশ, ও না হয়, বিলোপ? সে আর কোন অংশে তোমার অযোগ্য নয়! বেচারী ত তোমার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে!

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাও আরও কি বলতে যাচ্ছিল, সহসা তাকে থামিয়ে দিয়ে মায়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে—নরেন-দা', শোন শোন।

কিছুদূর দিয়ে যে ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, এই আহ্বানে সে ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল; বল্লে—বেশ ত গল্প চলছিল, মাঝপথে হঠাৎ আমাকে তলব হ'ল কেন?

—কোথায় যাচ্ছ? ইলা-দি'র বাড়ি? সে যাবে'খন। বোসো না, একটু গল্প করি। আজ এসেছ বুঝি? কলকাতার খবর কি? তোমার সেই প্রেমাক্রান্ত বন্ধুটির কিনারা হ'ল কিছু?

নরেন সেই স্কুলেরই কর্ম্মাধ্যক্ষের পুত্র। বিবাহিত। পিতা-মাতা এবং স্ত্রী এইখানেই বারোমাস থাকে; নরেন কলকাতার মেসে থেকে পড়া-শোনা করে এবং প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে বাপ-মায়ের কাছে আসে। মেসের বন্ধু মিলে তাদের একটি ক্লাব আছে—

সাহিত্য-শিল্পচর্চ্চার বৈঠক। সেখানকার একটি বন্ধু জনৈকা সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছে এবং তার সেই ভালোবাসার কাহিনী নিয়ে রজত নামে তাদের অপর-একটি সাহিত্যিক-বন্ধু মাসিক-পত্রে এক মজার গল্প লিখে বন্ধুবর্গের কৌতুক বৃদ্ধি করেছে। নরেন মায়ার কাছে এই-সব কথা গল্প ক'রে বলেছে এবং নূতন কিছু খবর থাকলে সে এখানে এসে সর্ব্বাগ্রে মায়াকে সে কথা জানিয়ে আনন্দ উপভোগ করে।

তার প্রশ্নের উত্তরে নরেন বল্লে—না, কৈ আর হ'ল! মেয়েটির ইচ্ছে আছে, তবে তার বাপ-মা—

মায়া বল্লে—মেয়েটির ইচ্ছে আছে? Splendid!—বাপ-মা-গুলোর জ্বালায় আর পারা যায় না! কি বলছে তারা, আর কাউকে ঠিক করেছে বুঝি?

নরেন বল্লে—প্রায়। মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রত্যুৎ ত ভয়ানক ভেঙে পড়েছে! শক্-টা নিতে পারলে হয়।

মায়া বলে উঠ্‌ল—ওই-গুলো নেহাৎ বাড়াবাড়ি। শক্ কি আবার! বিয়ে হ'ল না—বিয়েই হ'ল না; তার জন্যে অমন সস্তা শক্ খাওয়া—বিশ্রী! মেয়েটা খুব ভাল তাই, পড়তেন ভদ্রলোক আমার পাল্লায়, তা হ'লে এমন ঘোল খাওয়াতাম যে, আর উঠে দাঁড়াতে হ'ত না।

নরেন বল্লে—তুমি ত সবাইকেই ঘোল খাইয়ে বেড়াচ্ছ,

কিন্তু তোমায় যে কে কবে ঘোল খাওয়াবে—তা ত এখনো জানতে পাচ্ছি না ?

মায়া বল্লে—সে পারবেও না কোনদিন। আচ্ছা, তোমার সেই লেখক-বন্ধুটির আর-কোন লেখা ত আজকাল দেখতে পাচ্ছি না ? বেশ মজার গল্পটি লিখেছিলেন কিন্তু !

নরেন বল্লে—হ্যাঁ, কিছুদিন থেকেই বিশেষ-কিছু লিখছে না। Final M. B. দিচ্ছে কি না,—তাই বোধ হয় ব্যস্ত আছে।

মায়া সাশ্চর্য্যে বল্লে—রজতবাবু ডাক্তার হবেন ?

—তা ত হবেন-ই ; এবং খুব ভাল ডাক্তার-ই হবেন। চৌকস ছেলে। বাসিমড়াও যেমন কাটে, মিঠে গল্পও তেমনি লেখে।

মায়া আপন-মনে বল্লে—সো ইন্‌টারেষ্টিং !

তারপর স্বর ফিরিয়ে প্রশ্ন করলে—এত প্রেমের গল্প যখন লেখেন, নিজে এতদিনে প্রদ্যুৎবাবুর দল বৃদ্ধি করেছেন নিশ্চয়ই ?

নরেন বল্লে—নিশ্চয়ই না। প্রেমের গল্পই লেখে, কিন্তু প্রেম ও মানে না।

মায়া বল্লে—মানেন না ! আশ্চর্য্য ত !

—ও বলে, ময়রা যেমন সন্দেশ খায় না, আমাদেরও তেমনি। ছানাকে যেমন চিনি মিশিয়ে ছাঁচের মধ্যেই মানায়

ভাল,—মেয়েদেরও তেমনি সাজিয়ে-গুজিয়ে প্রেমের গল্পের নায়িকা-রূপেই বেশ দেখায়। বাস্তব জগতে ওরা টোকো ছানা।

মায়া ভুরু কুঁচ্‌কে বল্লে—ইস্‌! ভারী যে চাল।

নরেন হেসে বল্লে—চাল তার মোটে নেই। আমাদের মধ্যে ওর মতো নম্র-প্রকৃতির ছেলে খুব কমই আছে।

এমন সময় স্কুলের আর একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে বল্লে—মায়া-দি' মাসিমা তোমায় ডাকছেন। সব্বাই এসেছে। গান আরম্ভ হয়ে গেছে? আজকে যে ফুল্‌ রিহারস্যাল,—তুমি জানো না?

নিজেদের অনুষ্ঠানের সাহায্য-কল্পে মেয়েরা একটি পুরুষ-ভূমিকা-বর্জ্জিত গীতি-নাট্য অভিনয়ের আয়োজন করেছে। অভিনয় হবে আগামী সপ্তাহে কলকাতার কোন এক বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে। সে-অভিনয়ে নৃত্য-গীতের প্রধান অংশ মায়ার ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

মায়া উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—আচ্ছা নরেন-দা' তোমার কলকাতার বন্ধুরা আমাদের প্লে দেখতে আসবে?

—আসবে না আবার! সেখানে ত সমারোহ প'ড়ে গেচে! তারা সব এর মধ্যেই টিকিট কিনে রেখেছে।

—সত্যি? বেশ ত! আচ্ছা তোমার ডাক্তার-বন্ধুটি বোধ হয় এ-সব দেখতে ভালবাসেন না, না?

—বাসে না! সে ত সব-কয় রাত্রেরই সীট্‌ বুক ক'রে

রেখেছে। এ-সব বিষয়ে তার মতো উৎসাহী আমাদের মধ্যে আর কেউ-ই নেই।

অভিনয় হয়ে গেছে। সব-শুদ্ধ অভিনয় হয়েছিল—তিন রাত্রি। শেষ রাত্রির শেষ-ট্রেণেই মেয়েরা ফিরে এসেছে। কাজেই, অভিনয় কেমন হ'ল তার বিশদ বিবরণ তারা পায় নি। তাই, সেই সপ্তাহের শেষে, পূজোর ছুটিতে নরেন যখন বাড়ী এলো তখন সবাই তাকে ঘিরে ধরল;—বিশেষ ক'রে মায়া। সে বল্লে—এই প্রথম প্রকাশ্যভাবে ষ্টেজে নাম্‌ছি। তাই নিন্দা-সুখ্যাতি দুটোই আমাদের কাছে মূল্যবান জিনিষ। তোমার বন্ধু-বান্ধবেরা কি বল্‌ল, বল।

নরেন বল্লে—অভিনয় খুব ভাল হয়েছে। দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে গেছে। বিশেষ, একজনের নাচ দেখে কবিতাও রচিত হয়েছে।

মায়া ব'লে উঠল—ইউরেকা! সে আমি নিশ্চয়! কিন্তু এমন পরম সমজদারটি কে নরেন-দা'?

—নাম বলতে বারণ আছে।

—আচ্ছা, নাম জানতে চাই নে, কিন্তু কবিতাটি কি শুনতে পাবো না?

নরেন পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বার ক'রে বল্লে—তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু, mind that, নাম বলব না।

দু'হাতের মাঝে কাগজখানা উঁচু ক'রে ধ'রে নরেন পড়তে সুরু করলে—

তোমারে হেরিনু দীপ্ত উৎসব অঙ্গনে
নৃত্য-ছন্দে উচ্ছলিত মায়া ... ...

সহসা বাজপাখীর মতো ক্ষিপ্রগতিতে মায়া কাগজখানাকে নরেনের হাত থেকে তুলে নিলে। অতর্কিতে এমন ভাবে কাগজখানা হাত থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে নরেন বিমূঢ় ব'নে গেল।

একটু পিছিয়ে গিয়ে, কাগজখানাকে পরিপাটি ক'রে ভাঁজ করতে করতে মায়া বল্লে—কবিতা যখন আমাকে উদ্দেশ ক'রে লেখা, তখন দরজা বন্ধ ক'রে একা আমি প্রথম পড়ব, তারপর তোমরা সবাই। কেমন ?

এই ব'লে, ভাঁজকরা কাগজখানা ব্লাউজের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিলে।

নরেন হেসে বল্লে—এমনতর রাহাজানির ব্যবসায় দ্বারা কেবল কাগজের টুক্‌রোই পাওয়া যাবে। আর কিছু নয়।

চলে যেতে যেতে মায়া বল্লে—ব্যবসায় এখন সবে সুরু কি না; তাই এখন যথালাভ।

পরদিন সকাল হ'তে না-হ'তেই মায়া নরেনকে একা পেয়ে

বল্লে—তোমার ডাক্তার-বন্ধুটি কিন্তু বেশ গুছিয়ে কবিতা লিখতে পারে! ভদ্রলোক দেখছি জানে না এমন জিনিষই নেই।

নরেন দুই চোখ বড়ো ক'রে বল্লে—রজত লিখেছে জানলে কেমন ক'রে? নাম দেওয়া ছিল না ত?

মায়া বল্লে—পুরো নাম না থাক্, কাগজের কোণে এমন কিছু ছিল, যাতে নামটা জানতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

নরেন হেসে বল্লে—ওঃ! কিন্তু, কৈ, আমার নজরে একেবারেই পড়ে নি!

মায়া বল্লে—ও সব সূক্ষ্ম বস্তু তোমাদের নজরে পড়বার জন্য নয়। সে যাই হোক্, কিন্তু কী বাড়িয়েই লিখেছেন! অন্য কেউ হ'লে এতক্ষণে গলে যেতো,—আমি নেহাৎ শক্ত মেয়ে তাই।

নরেন বল্লে—কবিতাটা দাও। পাঁচজনকে প'ড়ে শোনাই। এনেছ সঙ্গে?

মায়া বল্লে—না, আনি নি। পাঁচজনকে প'ড়ে শোনাবার জন্য রজতবাবু কবিতা পাঠান নি। তা ছাড়া, পাঁচজনকে প'ড়ে শোনাবার মতো নয়ও। পাঁচ-ছত্র কবিতায় পাঁচশোটা ছন্দ-পতন।

প্রস্থান-রত নরেন হেসে বল্লে—তাই না কি? তা হ'লে ছন্দগুলো তুমি ঠিক ক'রে নিও; আমি ইতিমধ্যে রজতকে চিঠি লিখে দি'—দু'দিন পরে নয়, পত্রপাঠ কালই তুমি এখানে

চ'লে এসো। আমার কাছ থেকে তোমার সম্পত্তি বেহাত হয়ে গেছে,—নিজের জিনিষ, নিজে এসে আদায় ক'রে নাও।

ঈষৎ আগ্রহ সহকারে মায়া প্রশ্ন করলে—রজতবাবু এখানে আসছেন না কি ?

—হ্যাঁ, তার এখানে বেড়াতে আসবার অনেক দিন থেকে ইচ্ছে। এবার আমি পনের দিনের ছুটী পেয়েছি ; আসবার সময় অনেক ক'রে তাকে ব'লে এসেছি।—বলেছে, সামনের সপ্তাহে আসবে।

মায়া আরও কিছুক্ষণ নরেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে চলে গেল। তার সামান্য ভাবান্তরটুকু নরেনের নজরে পড়ল না।

ট্রেণ থেকে নেমে নরেনের জিম্মায় তার সুটকেস্ এবং নিজেকে সমর্পণ ক'রে অনভ্যস্ত রজত যখন আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করলে তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

দুই বন্ধুতে বাড়ী যাবার জন্য গাড়িতে উঠে বসতেই রজত ব'লে উঠ্‌ল—ওহে দেখ দেখ, কী সুন্দর চাঁদ উঠ্‌ছে !

সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত মাঠের কোলে চাঁদের অনাবৃত কলেবর ভেসে উঠেছে। নরেন বল্লে—তাই না কি ! চাঁদ উঠ্‌ছে ? আশ্চর্য্য ত !

দু'জনেই সশব্দে হেসে উঠ্‌ল।

নরেন বল্লে—ওহে রজত, কবিতাটা ত তোমার কাছ থেকে কেড়ে আনলাম, কিন্তু ভাই, সেটা খোয়া গেছে।

রজত হেসে বল্লে—যাক্‌ গে। এমন কিছু মহার্ঘ বস্তু নয়।

নরেন সস্মিত-মুখে বল্লে—ঠিক খোয়া যায় নি,—মায়া আমার কাছ থেকে সেখানা ছিনিয়ে নিয়েছে; কিছুতেই আর ফেরৎ দিচ্ছে না।

কথা শুনে রজত অতিশয় লজ্জিত কণ্ঠে বল্লে—এঃ! কেন তুমি দিলে? কি ভাবছে সে হয়ত। ভালো ক'রে যদি লিখতে জানতাম, তা হ'লে না হয় কথা ছিল। একে অত্যন্ত অক্ষম রচনা, তায় তোমার মায়া যে-রকম দুর্দ্দমনীয়া বলে শুনেছি,—হয়ত কবিতার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকবে না।

বাড়ী এসে নরেন, রজতের জন্য যে-ঘর ঠিক ক'রে রাখা হয়েছিল, সেই ঘরে তাকে নিয়ে গেল। চাকর এসে বিছানা পেতে দিলে। নরেন তার খাবার ব্যবস্থা করতে বাড়ীর ভিতর প্রস্থান করলে।

পুব-দিকের জানালাটা খুলে দিতেই সদ্য-ওঠা চাঁদের আলোয় ঘর যেন প্লাবিত হয়ে গেল। রজতের খুব ভাল লাগছিল। সে জানলার ধারে এসে আলোর বন্যায় গা মেলে দাঁড়াল। এমনতর বড়ো চাঁদ আর এত আলো সে যেন জীবনে প্রথম দেখ্‌ছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর নরেন বল্লে—দেখ রজত, কাল খুব ভোরে আমি একবার বেরুবো ; বেশী দূরে নয়, পরের ষ্টেশনে আমার মাসিমার কাছে। তাঁকে নিয়ে আমি দুপুরের মধ্যেই ফিরবো। সকালবেলাটা তুমি একাই ঘুরে চারিদিক দেখে বেড়িও। কোন অসুবিধে হবে না।

রজত জানালার ওপর বসে ছিল ; হেসে বল্লে—বেশ ভাই ; পড়েছি এসে তোমার হাতে,—এখন যা বলবে তাই করবো।

—না হে না, ভাবছ কেন ? সকালবেলাটা বৈ ত নয়।

রজত যে অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের সঙ্গ বিশেষ স্বচ্ছন্দ-চিত্তে গ্রহণ করতে পারে না , তা নরেন ভালই জান্‌তো। সে-কারণে সকালে তার অনুপস্থিতির জন্য সে রজতকে আগে থাকৃতেই ওয়াকিফ্ ক'রে রাখছিল।

রজত বেড়াতে বেরিয়েছে।

পূর্ব্ব-দিগন্তে মাঠের শেষে সূর্য্য তখনো সবখানি উঠে দাঁড়ায় নি। গাছে গাছে পাখীদের জাগার গান শোনা যাচ্ছে। মাঠের বুকে শ্যামল ঘাসের ওপর রূপালি আভা,—শিশির-বিন্দুগুলো ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌ছে। মাঠের মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলার যে-পথটা গ্রাম ছাড়িয়ে পশ্চিমের দিগন্ত-রেখায় গিয়ে মিশেছে, তার মাটির গৈরিক রঙ্ সূর্য্যের আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে। বহুদূর

থেকে কোন অদৃশ্য-কণ্ঠের প্রভাত-বন্দনার সুর বাতাসে ভেসে আসছে।

রজত মুগ্ধ হয়ে গেছে। ইট-কাঠ-ঘেরা মেসের রুদ্ধ ঘরের বদ্ধ বাতাস, ধূলি-ধূসর রাস্তা আর কৃপণ প্রকৃতির রুক্ষশোভা,—এরই মধ্যে সে বড়ো হয়ে উঠেছে। তার বাইরে এক পা-ও সে বাড়ায় নি এর আগে কোনদিন। তাই আজ তার আগল-মুক্ত মন আনন্দে বিভোর হয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছিল—জন্মাবধি যেন সে কোন্ শত্রুর অন্ধকূপে বদ্ধ ছিল, এতদিন পরে সেখান থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে; সেই অন্ধকার ঘর ছেড়ে আজ সে যেন এই প্রথম মুক্ত বাতাসে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে সূর্য্য অনেকখানি পথ ভেঙেছেন। পাখীরাও বাসা ছেড়ে পাখা মেলেছে। সহসা রজত থমকে দাঁড়াল। যে-পথ দিয়ে সে চলছিল, তার পশ্চিম-দিকে মাঠের ওপর যে ছাতিম-গাছটা দাঁড়িয়ে আছে তারই একটা নুয়ে-পড়া ডালে এক-জোড়া পাখী ব'সে। এমন বিচিত্র রঙীন পাখী সে কখনো দেখে নি। প্রথমে মনে হয়—পায়রা; কিন্তু পাখার রামধনু রঙ ত পায়রার নয়, আর পায়রার গ্রীবাও অমন সুন্দর হয় না। পাখী দুটো পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে ক্রমাগত এক সুরে কূজন ক'রে চলেছে। রজতকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

রজতের যে-হাতে ক্যামেরাটা ছিল, সেই হাত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। অনেক দিন ধ'রে অনেক প্লেট্ নষ্ট ক'রে সে এখন

একজন পাকা ফটো-তুলিয়ে। এমন সুন্দর পশ্চাৎ-পটের সামনে ওই দুর্লভ পাখী-দুটোকে ধ'রে রাখতেই হবে! রজত ক্যামেরা খুলে ফেল্লে।

যন্ত্রটা ফিট্ ক'রে, সেটা চোখে লাগিয়ে ফোকাস্ ঠিক করছে, এমন সময় কাঁচের ওপর ছায়া পড়ল। মুখ তুলে সে দেখলে, একটি মেয়ে সোজা ক্যামেরার সামনে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেই ছাতিম-গাছটার তলায় যে চওড়া বেদী আছে, তারি ওপর বসল—রজত এবং তার ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে। তার বসার সঙ্গে সঙ্গে পাখী দুটোও গেল উড়ে।

রজত মহা বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। অমন সুন্দর একখানা ছবি,—বেরসিক মেয়েটা একেবারে মাটী কোরে দিলে! ফোটো-খানা যে খুব ভাল হ'ত সে-বিষয়ে তার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। কে জানে, হয়ত Kodak-এর প্রতিযোগিতায় ছবিখানা প্রাইজ পেতে পারত; ফাষ্ট্-প্রাইজ—আড়াই-হাজার টাকা! কে বলতে পারে?

পাখী-দুটো যেমন গেছে,—ওর একটা ছবি নিতে হবে। যেমন কে তেমন! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত ধ'রে রজত চিন্তা ক'রে নিলে। তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির পিছনে দাঁড়িয়ে বল্লে—দেখুন!

সহসা পিঠের কাছে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে মেয়েটি চম্‌কে উঠে ঘাড় ফেরালে। তার মুখের ওপর দৃষ্টি পড়তেই রজত

বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেল! এ-মুখ যে একান্ত চেনা, অত্যন্ত পরিচিত! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

মেয়েটি তার ভাব দেখে নিজেই কথা বল্লে—আমাকে কিছু বলবেন?

রজত ভরসা পেয়ে বল্লে—হ্যাঁ, দেখুন, আপনি আমার একটি মস্ত ক্ষতি করলেন।

—সে কি! কেমন ক'রে?

—আপনি যেখানটায় এসে বসলেন, আমি সেই গাছটার ছবি নিচ্ছিলাম। আপনি আসাতে আমার ছবি নষ্ট হয়ে গেল।

মেয়েটি হাস্‌ল। হাসিটা তাচ্ছিল্যের। বল্লে—আমার বটানির জন্যে এই গাছের পাতাগুলো আমায় আঁকতে হয়। সুতরাং আমার কাজ করতে আমি এখানে এসেছি, অপরের কি ক্ষতি হ'ল, তা দেখবার প্রয়োজন আমার নেই। আর বেশ ত, এ-রকম গাছ আরো অনেক আছে, সেই-একটার ছবি তুলে নিন না।

কথা আরম্ভ ক'রে দিয়ে রজত মনে অনেকটা বল পেয়েছে। মনে মনে বলছে—এমন background-এ এ-ছবি যদি না তুলতে পারি, তা হ'লে বৃথাই আমার এতদিনের শিক্ষা।

মেয়েটির কথার উত্তরে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে সে বল্লে—আজ্ঞে, ঠিক তা নয়; গাছের ওপর এক-জোড়া ভারী চমৎকার পাখী বসেছিল,—আপনি আসাতে তারা উড়ে গেল।

মেয়েটির মুখের চাপা-হাসি এবার স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল; বল্লে—ও, তাই। তা কি করবো বলুন; আমি জান্‌তে পারি নি। কিছু মনে করবেন না।

কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে, একটু থেমে রজত বল্লে—তা করব না, যদি আপনাকে একটি অনুরোধ করবার অনুমতি পাই।

রজত মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল,—ততক্ষণে তার মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে গেছে; এক মুহূর্ত্ত মৌন থেকে গম্ভীর-মুখে সে বল্লে—কি অনুরোধ, বলুন।

কি-ভাবে কথাটাকে প্রকাশ করবে রজত কিছুতেই তা ঠিক করতে পাচ্ছে না; শেষে, এক-নিঃশ্বাসে সে বলে ফেল্লে—যদি আপনার একখানা ছবি তুলতে অনুমতি দেন, তা হ'লে আর কোন ক্ষোভ থাকে না!

তার কথা শুনেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল; শঙ্কিতচিত্তে রজত ভাবলে—এইবার বোধ হয় সে সে-স্থান পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবে। কিন্তু না, মেয়েটি দাঁড়িয়ে থেকেই বল্লে—এ কিন্তু আপনার অন্যায় অনুরোধ। আপনার পাখী না হয় উড়ে গেছে, তাই ব'লে আমার ছবি তুলবেন—এ কেমন কথা!

রজত বুঝলে, মুখে যাই বলুক মেয়েটির মন তার কথায় রাজী হয়েছে। সে একটু পিছিয়ে এসে ক্যামেরার ফোকাস্ ঠিক ক'রে নিতে লাগল।

পূর্ব্বাপর

মেয়েটির জরদ-পাড় শাড়ীখানার প্রান্ত এসে মাটীতে ঠেকেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে তার সারা গায়ে, মুখে, অবিন্যস্ত চুলের গোছার ওপর।

ক্যামেরা ব্যবহারের আগে রজত আর একবার মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। সবই চমৎকার, কিন্তু বড্ড গম্ভীর মুখ। ওই সুন্দর মুখখানায় অল্প একটু হাসি ফুটিয়ে তোলা যায় কেমন ক'রে?

সহসা মেয়েটি বলে' উঠ্‌ল—আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না। আমি চল্লাম।

রজতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—তা হ'লে আমার পাখীও গেল, আপনিও গেলেন?

এ কথার পর হাসি চেপে রাখা মেয়েটির পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। হাসি-মাখানো মুখখানাকে ফিরিয়ে নিতে নিতে সে বল্লে—আপনার দুরদৃষ্ট নিশ্চয়, কিন্তু আমি কি করব বলুন!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রজত সুকৌশলে কল টিপে দিলে। মেয়েটির ব্রীড়া-রঞ্জিত মুখের সেই অপূর্ব্ব শোভাটি তার ক্যামেরার কক্ষে চিরদিনের মতো বন্দী হয়ে রইল।

রজতের কাজের এই সাফল্য মেয়েটি জানতে পারলে কি না, ঠিক বোঝা গেল না। সে তার বই এবং খাতাখানি বুকের কাছে তুলে নিয়ে মন্থর-গতিতে সেখান থেকে চলে গেল।

যতদূর দেখা যায় রজত নির্নিমেষ নয়নে মেয়েটির গমনপথের

দিকে চেয়ে রইল। চলার ছন্দ, গতির মূর্চ্ছনা প্রভৃতি কাব্যিক-কথাগুলো সে এতদিন শুধু পড়েই এসেছিল; আজ জীবনে প্রথম উপলব্ধির মধ্যে তাদের আস্বাদ গ্রহণ করলে।

বারোটার পরেই নরেন বাড়ী ফিরে এল। তারপর খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম অন্তে তারা দু'জনে বেড়াতে বার হ'ল।

কয়েক-পা এগিয়েই রজতের নজরে পড়ল—সকালের দেখা সেই মেয়েটি একেবারে তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে। তাকে দেখেই নরেন বলে উঠল—আরে, মায়া যে! কতদূর যাচ্ছ?

মায়া ঘাড় ঘুরিয়ে দু'জনকেই একবার দেখে নিলে; তারপর নরেনের দিকে চেয়ে বল্লে—তোমাদের বাড়ীই যাচ্ছিলাম, নরেন-দা'—বৌদি'র কাছে একটা শেলাই-এর নক্সা শিখে নেব বলে'।

মায়া পা বাড়াতেই নরেন বল্লে—সে ত বাড়ীতে নেই; কোথায় বেড়াতে বেরিয়েছে।

নেই? মায়ার গতি রুদ্ধ হ'ল। তা হলে এখন আর গিয়ে কি হবে? সে ফিরল। সেই অবসরে নরেন তার কাছে গিয়ে বল্লে—মায়া, যে ভদ্রলোকটিকে আমার সঙ্গে দেখছ, উনিই হচ্ছেন আমার বন্ধু—রজত রায়। রজত, ইনিই হচ্ছেন মিস্ মায়া সেন।

পূর্ব্বাপর

সকালবেলাকার প্রথম দর্শনেই রজত মায়াকে চিনতে পেরেছিল। কিন্তু রজতের পরিচয় শুনে মায়া একেবারে অবাক্ হয়ে গেল! এই—রজত! সঙ্গে সঙ্গে কি-জানি কোন্ অনির্ণেয় কারণে রজতের ওপর মায়া ভীষণ রাগান্বিত হয়ে উঠ্‌ল।

রজত হাসিমুখে এগিয়ে এসে তাকে নমস্কার করলে; সে অভিবাদনের মধ্যে পরিচয়ের সুর নিতান্তই সহজ হয়ে বেজে উঠ্‌ল। কিন্তু মায়া না করলে একটা প্রতি-নমস্কার, না বল্লে কোন কথা। নরেন তখন রজতকে শুনিয়ে শুনিয়ে মায়ার নানাবিধ গুণের সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা আরম্ভ ক'রে দিলে। কিন্তু মায়ার কানে তার একটা কথাও প্রবেশ করলে না। সকালে কেন রজত মায়ার কাছে তার আত্ম-পরিচয় দিলে না? মায়াকে সে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিল, তবে কেন সে নিজের পরিচয় গোপন করলে? রজতের এই পরিচয় না-দেওয়াকে মায়া একটা দুরপনেয় অপরাধ ব'লে মনে করতে লাগল; সে দুষ্কৃতির যেন আর মার্জ্জনা নেই!

মায়ার ভাবহীন রক্তিম মুখ দেখে রজত মনে মনে ভয় পেয়ে গেল। নরেন কিন্তু তার এই স্তব্ধতাকে নারী-সুলভ লজ্জা বলে' গ্রহণ ক'রে সোৎসাহে বল্লে—কবিতা ত আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে; কিন্তু কেমন হয়েছে, সে-কথা ত একবারো বল্লে না। যে-রকম নির্জ্জলা প্রশস্তি,—খুব খুসী হয়েছ নিশ্চয়?

মায়া এইবার রজতের দিকে চোখ ফেরালে, তারপর নিতান্ত খাপছাড়া স্বরে বল্লে—আপনি লিখেছেন বুঝি ?

রজত সস্মিত-মুখে মৌন হয়েই রইল। নরেন বল্লে—বাঃ, এতক্ষণ সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে এখন প্রশ্ন হল—'আপনি লিখেছেন বুঝি !' কেন, তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না, না কি ?

মায়া এইবার হাসবার চেষ্টা ক'রে বল্লে—বেশ ত লিখেছেন ! তা, এ রকম কবিতা সব-শুদ্ধ ক'খানি রচনা করেছেন ? অনেক-গুলি খুব সম্ভব ?

কথাগুলো সে বল্লে, না নরেনের দিকে তাকিয়ে, না রজতের দিকে।

সহসা পিছন থেকে মাথায় কঠিন লাঠির আঘাত পেলে মুখের যে-অবস্থা হয়, মায়ার কথা শুনে রজতের মুখের অবস্থা বোধ করি তারও চেয়ে খারাপ দেখাল। কিন্তু মনের জোর তার ছিল অসাধারণ। নিমেষ মধ্যে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে সে তার মুখের পূর্ব্বেকার হাসিটুকু ফিরিয়ে আনলে ; তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লে—খুব বেশী নয়, এই নিয়ে পাঁচখানা হবে।

নরেন এদের কথা শুনে বিহ্বল হয়ে গেছে ! এরা বলে কি ? সে যে কি-ক'রে হঠাৎ-ঘনিয়ে-আসা-মেঘের মতো এই বিশ্রী অবস্থাটাকে সহজ ক'রে তুলবে তার কোন হদিসই খুঁজে পাচ্ছে না।

প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গেই এমন সহজ উত্তর মায়া আশা করে নি ;

তাই সে রজতের কথা শুনে আরক্ত মুখে মুহূর্ত্ত-কাল নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রৈল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বল্লে—সে আমি জানি। চল্লাম নরেন-দা'। কিন্তু এরপর যখন কলকাতা থেকে কবিতা ব'য়ে আনবে তখন তার ছন্দগুলো অন্ততঃ একটু দেখে-শুনে এনো,—তা হ'লে আর যাই হোক্, সে-গুলো পাঠক-পাঠিকার উপহাস থেকে রক্ষা পাবে।

মায়া দৃষ্টির বাইরে যেতেই রজত উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—কী আশ্চর্য্য মেয়ে!

নরেনের মনে হ'ল, রজত যেন পরিহাস ক'রেই ও-কথা বল্লে। আর, প্রথম সাক্ষাতেই মায়া তার সঙ্গে যে রকম চমৎকার ব্যবহার করলে, তা'তে পরিহাস সে পারে করতে। তাদের বাড়ীর অতিথি এবং তার পরম বন্ধুর প্রতি তাদেরই স্কুলের একটি মেয়ের এমন অশিষ্ট আচরণে নরেন লজ্জিত হয়ে পড়ল। খানিকটা ক্ষমা প্রার্থনার সুরেই সে বল্লে—কিছু মনে কোরো না, রজত। ও-মেয়েটা চিরকালই ওই রকম খামখেয়ালী। কাকে যে কী বলে' বসে, তার একটুও জ্ঞান থাকে না ওর।

রজত হাসিমুখে বল্লে—মনে করব কি হে, আমি ত মুগ্ধ হয়ে গেছি! কী দীপ্ত সতেজ চরিত্র! আমাদের সমাজে এ এক অভিনব জিনিষ। কিন্তু আমি ভাবছি—খামোকা উনি আমার ওপর অতখানি চটে' উঠ্‌লেন কেন?

সঙ্গে সঙ্গে সকালের ঘটনার কথা তার মনে পড়ে' গেল।

হয়ত অমন-ক'রে ফোটো তুল্‌তে চাওয়াতেই মায়ার মনের মধ্যে সকাল থেকেই তার ওপর ক্রোধ সঞ্চিত হচ্ছিল, এখন সেটা শুধু উৎক্ষিপ্ত হ'ল মাত্র। কিন্তু না, রাগের কোন লক্ষণই ত সকালে সে মুখে ছিল না। তবে? রজত ভাবতে লাগল। ফটোতোলার কথা সে কি নরেনকে বলবে? থাক্‌ এখন; তাড়াতাড়ি কি?' সময় মতো বললেই হবে।

দু'জনেই এই অসুখকর ঘটনাকে চাপা দিয়ে অন্য নানা কথা আলোচনা করতে করতে তাদের বৈকালিক ভ্রমণ সমাধা করলে। কিন্তু, বলা বাহুল্য যে, সে বেড়ানো তেমন জম্‌ল না।

পরদিন।

দুপুর-বেলা রজত তার ঘরের বিছানার ওপর ব'সে জিনিষ-পত্র গোছাচ্ছে। আজ বিকালের গাড়িতেই সে বাড়ী ফিরবে।

নরেন ঘরে প্রবেশ ক'রে বল্লে—ওহে রজত, তুমি চলে যাচ্ছ শুনে একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন; কিন্তু তোমার অনুমতি না পেয়ে ত ঘরে ঢুকতে পারেন না; তাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

রজত উঠে দরজার কাছে এসেই দু'হাত তুলে নমস্কার ক'রে বল্লে—আসুন।

কুন্ঠিত-পদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে মায়া বল্লে—আপনি আজই যাচ্ছেন না কি ?

এবার আর সে প্রতি-নমস্কার করতে ভুল করলে না।

রজত হেসে বল্লে—হ্যাঁ। দু'দিনের জন্যই ত এসেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে—না এলেই বোধ করি ছিল ভাল। শুধু শুধু দু'দিন থেকে এঁদের সকলের ওপর খুব খানিকটা উপদ্রব ক'রে গেলাম।

এই বলে' নরেনের বাড়ীর গুরুজনদের স্নেহ, প্রীতি এবং আতিথ্যের ওপর এক উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদ শেষ ক'রে রজত বল্লে—যাই হোক্, এখানে এসে এই দু'দিনেই জীবনের অনেক নতুন দিকের পরিচয় লাভ করলাম। অনেক দিক থেকেই এ-স্থানটি আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কালকের আকাশে যে বিশ্রী মেঘটা জট্ পাকিয়ে উঠেছিল, নরেনের মনে হচ্ছে, আজ যেন তা মিলনের হাওয়ায় দিক-চক্রবাল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিশেষ ক'রে, রজতের চলে যাবার কথা শুনে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবার জন্য মায়ার এই প্রচ্ছন্ন আগ্রহ নরেনের মনকে একেবারে হাল্কা নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়েছে। রজতের প্রতি কালকের ব্যবহারের জন্য মায়া লজ্জিত হয়ে পড়েছে ; এবং তার এই লজ্জাকে নরেন সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি দিয়ে অনেক বড়ো ক'রে দেখে ভারী আনন্দ লাভ করছে।

রজতের নাতি-দীর্ঘ উচ্ছ্বাস শেষ হ'তেই নরেন বল্লে—ওহে, তুমি জিনিষপত্র গুছোও; আমি তোমার জন্যে একখানা গাড়ি ঠিক ক'রে আসি।

এই ব'লে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কালকের ঘটনার পর থেকে সারাক্ষণ মায়া অন্তরের মধ্যে সত্যিই একটা গ্লানি অনুভব করছিল; কিন্তু তাই ব'লে, মুখে দুঃখ প্রকাশ ক'রে তাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করবে তেমন মেয়েই সে নয়।

সমস্ত ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে নেবার জন্য স্মিত-মুখে সে বল্লে—নরেন-দা'র বাড়ীর সকলে সত্যিই খুব চমৎকার লোক; কিন্তু ও ত গেল বন্ধুর সম্বন্ধে আপনার অভিমত। এ জায়গাটা কেমন লাগল, বলুন ত।

রজত তৎক্ষণাৎ বল্লে—এত ভাল লেগেছে যে, খুব চমৎকার, ভারী সুন্দর ইত্যাদি অনেক কথা বল্লেও অতি অল্পই বলা হবে। স্থানটি যেন ছোট্ট-খাট্ট একটি সুন্দর সাজানো ফুলের বাগানের মতো স্নিগ্ধ এবং রমণীয়।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিহাস করবার লোভ সে কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলে না, বল্লে—কিন্তু আপনাদের এ বাগানে ফুলই শুধু নেই, কাঁটাও বিলক্ষণ! ব'লে মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগল।

কথাটা রজত বল্লে নিছক রহস্যের ছলে, একান্ত হাল্কাভাবে।

কিন্তু কিছুক্ষণ নীরব থেকে মায়া যা উত্তর করলে তা যেমন কঠিন, তেমনি গভীর ; বল্লে—ফুল তুলে তুলে যাদের সাহস নিরন্তর বেড়েই চলেছে, এখানে এসে তারা কিছু শিক্ষা পেয়ে যাবে,—সেই জন্যই এখানকার আয়োজন একটু স্বতন্ত্র।

কথা শুনে রজতের মুখ পাংশু হয়ে গেল। সামান্য পরিহাসের উত্তরে এ কী মর্ম্মান্তিক কটূক্তি ! ও-মেয়েটি কি কোন বস্তুকে কিছুতেই সহজভাবে নিতে জানে না ; মানুষকে নিষ্ঠুর-ভাবে আঘাত করাই কি ওর স্বভাবের একমাত্র ধর্ম্ম ? রজত বারেকের জন্য মায়ার মুখের পানে তাকিয়ে নীরবে তার কাজ ক'রে যেতে লাগল।

ঘরের মধ্যেকার বিক্ষুব্ধ মৌনতা মায়ার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। বাইরে যাবার জন্য মুখ ফেরালে, কিন্তু পা নড়ল না। তারপর, যা-হোক্-কিছু বলবার জন্যই যেন বল্লে—নতুন স্থান থেকে অপরিচিতা মেয়ের ফটো তুলে আনাকে আপনাদের তরুণ-সম্প্রদায় নিশ্চয়ই একটা মস্ত বড় কৃতিত্বের নিদর্শন বলে' মনে করে ; বন্ধুবান্ধবদের কাছে খুব সম্ভব আপনার এই কাজের জন্য অনেক প্রশংসা পাবেন। নরেন-দা'কেও ফটোতোলার কথা বলেছেন বোধ হয় ?

রজত ধীরে ধীরে উত্তর দিলে—বন্ধুবান্ধবের কাছে ফটো দেখিয়ে বাহাদুরী নেবার স্পৃহা এখনো আমার মনে জাগে নি ; নরেনকেও এখনো কোন কথা বলি নি।

রজতের এই কথা মায়ার মনে এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি বহন ক'রে নিয়ে এল। সহসা সে বলে ফেল্লে—নরেন-দা'কে ও কথা না জানালেই ভাল হয়।

মায়ার কথার সুরে বিস্মিত হয়ে চোখ মেলে রজত বল্লে—বেশ। আপনার অনুরোধ রক্ষিত হবে।

মায়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে—ধন্যবাদ!

কিন্তু তারপরেই সে নিজের ওপর বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠ্‌ল। কেন সে রজতকে ও-কথা বলতে গেল? ও হয়ত মনে মনে কি ভাবছে, কে জানে! পরক্ষণেই অন্তরের উদ্বেলিত ক্রোধ গিয়ে পড়ল—রজতের ওপর। ওর ফটোতোলার জন্যই ত মায়া ওর কাছে এতখানি বিব্রত হ'ল!

পরমুহূর্ত্তেই তার মুখ দিয়ে যে বাক্য নির্গত হ'ল, রজতের কাছে তা যেমনি অপ্রত্যাশিত, তেমনি রূঢ়! কথাটা বলবার পরেই মায়া নিজেও মনে মনে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল এবং তার সপক্ষে নিজের অন্তরের কাছেও সে কোন কৈফিয়ৎ পেশ করতে পারে নি।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বল্লে—আচ্ছা, আপনি বল্লেন—আমাকে যে-রকম কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, সে-রকম কবিতা আরও চারখানা লিখেছিলেন; মেয়েদের কাছে শুধুই কি কবিতা লিখে পাঠান?

কথার আঘাতে রজত যেন অসাড় নিস্পন্দ হয়ে গেল।

অপমানের বেদনায় তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল ; ঠোঁটদুটো বারকয়েক কেঁপে উঠ্‌ল, পরক্ষণেই সে বল্লে—না, সময়ে সময়ে তাদের ফটোও তুলে থাকি।

এর উত্তরে মায়া কি বল্‌ত, কে জানে। বাইরে নরেনের সাড়া পাওয়া গেল। ঘরে প্রবেশ ক'রে সে বল্লে—তোমার গাড়ি ঠিক ক'রে এলাম রজত।

তারপর, বৈকালিক জলযোগ সমাপন ক'রে গুরুজনদের কাছে বিদায় নিয়ে রজত যখন নরেনের সঙ্গে বাড়ীর বার হ'ল তখন বেলা পড়ে' এসেছে।

দিন চারেক পরে মায়া একখানা চিঠি পেলে। চিঠিখানা খুলে, পাতা উল্টে, তলায় নামটা দেখেই সে সেখানা একটা মোটা বই-এর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল ;—রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের শয্যায় ব'সে সেখানা পড়তে লাগল। চিঠিতে লেখা ছিল—

সুচরিতাসু—

সাধারণত এত সামান্য পরিচয়ে আপনাকে পত্র লেখা হয়ত আমার পক্ষে শোভন হ'ত না, কিন্তু আপনার সঙ্গে যে-

যৎসামান্য পরিচয় হয়েছে এবং বন্ধুর কাছ থেকে আপনার কথা যা শুনেছি, তাতে এ-কথা নিঃসংশয়ে বুঝেছি যে, কোন সাধারণ নিয়মই আপনার পক্ষে খাটে না। তাই আজ আপনাকে এই পত্র লিখতে সাহসী হলাম। দুঃসাহসিকতা যদি কিছু ক'রে থাকি—মার্জ্জনা করবেন।

ভুল করা মানুষের ধর্ম্ম, এ যেমন সত্যি, ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে তার শাস্তিও পেতে হয়, তাও তেমনি সত্যি। মনের খেয়ালে কাগজের বুকে কবিতার যে আঁচড় কেটেছিলাম, আমার সে নিতান্ত অক্ষম প্রচেষ্টাকে একান্ত গোপন ক'রে রাখাই উচিত ছিল; তা না ক'রে তাকে যে লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছি, সে আমার ভুলের উপযুক্ত প্রতিদান,—তার জন্য অনুমাত্রও দুঃখ করিনে।

এখন, আপনার কাছে একটি বিনীত অনুরোধ আছে। বিদ্রূপের পাত্র হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক বেশী সহনীয়;—আমার কবিতার যে-লাঞ্ছনা প্রাপ্য ছিল তা সে পেয়েছে, তাই, যদি সেটা আজো আপনার কাছে থাকে, দয়া ক'রে তাকে নষ্ট ক'রে ফেলবেন,—ছিঁড়ে কুটিকুটি ক'রে পথের আবর্জ্জনার সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দেবেন; সেই হবে তার বিড়ম্বিত জীবনের উপযুক্ত অবসান।

আপনার যে ছবিখানা তুলেছিলাম, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি তার একখানি-মাত্র ছবি প্রিণ্ট্ কোরেছি। সেখানি এই

সঙ্গে আপনাকেই পাঠালাম। এখন, যে নেগেটিভ্-প্লেট্খানি আমার কাছে আছে, সেখানার প্রতি আপনার যদি কোন আদেশ থাকে, জানাবেন। যদি সেখানা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেন, দেব। যদি সেখানা নষ্ট করতে বলেন,— না, নিজের হাতে তাকে আমি ভাঙ্‌বো না; যদি বলেন, আপনার হাতেই তাকে অর্পণ করব।

নমস্কার নেবেন। ইতি,

শ্রীরজত রায়

পত্র শেষ ক'রেই মায়া খামের মধ্যে থেকে ফটোখানা বার ক'রে নিলে। তারপর তাকে আলোর নীচে ধ'রে দুই চোখের ব্যগ্র-দৃষ্টি নিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

এ কী! এ কী রকম বেহায়ার মতো ছবি তুলিয়েছে সে,— মাগো! নির্জ্জন-ঘরে একাকী মায়া লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ল। চকচকে কাগজের ওপর তার দুই-চোখের এ কী সলাজ বিমুগ্ধ দৃষ্টি! সারা অঙ্গ ঘিরে তার নববধূর মতো এমন কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা এলো কেমন ক'রে? ব্রীড়াবনত মুখে এমন মধুর আবেশ কে মাখিয়ে দিলে? ছি ছি ছি! এ-ছবি যদি বন্ধুরা দেখে, তা হ'লে তার লজ্জার আর শেষ থাকবে না। এ-ছবি সে ছিঁড়ে ফেলবে।

কিন্তু ছবিটা যে তুলেছে তার কি পাকা হাত! মুখের সমস্ত রেখ-গুলি ঠিক স্পষ্ট উঠেছে ছবিতে; এমন-কি বাঁ-গালের নীচে ছোট্ট তিলটি পর্য্যন্ত বাদ যায় নি! সুন্দর উঠেছে ছবিখানা! কিন্তু না, একে এই বেলা কুচিকুচি ক'রে ফেলাই ভাল,—বিশ্রী ছবি!

আচ্ছা, ছিঁড়ে না ফেলে লুকিয়ে রেখে দিলেও ত হয়? তা হলেও ত কেউ জানতে পারবে না! সেই ভাল। মায়া উঠে তার টাঙ্ক্‌টা খুলে ফেল্লে। তারপর জামা কাপড়ের সব-তলায়, যেখানে আর একটা ভাঁজ-করা কাগজ সযত্নে রক্ষিত ছিল তার পাশে ছবিখানা রেখে দিলে। বাক্সটা বন্ধ ক'রে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। ছবিখানা যতক্ষণ চোখের সামনে ছিল, ততক্ষণ এত লজ্জা লাগছিল তার!

বিছানায় ব'সে চিঠিখানা সে আগাগোড়া বারবার পড়তে লাগল। যতবারই সেখানা পড়লে, ততবারই তার পরিচ্ছন্ন সুডৌল অক্ষরের অন্তরালে একটি মার্জ্জিত এবং আঘাত-ক্লিষ্ট অন্তরের কথা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। এর কি উত্তর দেবে সে? বলবে কি যে, কবিতা সম্বন্ধে রজতের এতখানি ব্যথিত আশঙ্কার কোন ভিত্তি নেই,—কবিতা সে কারুকেই দেখায় নি? বলবে কি, যে-সব মন্দ কথা সে রজতকে বলেছে তাদের সঙ্গে তার অন্তরের কোন যোগ নেই? বলবে কি—? না না, মায়া কি পাগল হয়ে গেছে! এমনতর দুর্ব্বলতাকে

সে কোনমতেই প্রশ্রয় দেবে না। একেবারে উত্তর না দেওয়াটা অত্যন্ত অভদ্রতা হবে, তাই সে সোজাসুজি একটা উত্তর লিখে দেবে; আর সে-চিঠি এখনই লিখে ফেলা ভাল। মায়া কাগজ-কলম নিয়ে পত্র-রচনায় প্রবৃত্ত হ'ল। প্রথমেই হাঙ্গামা বাধলো—সম্বোধন নিয়ে। কি দিয়ে সে পত্র-লেখককে সম্বোধন করবে? 'সবিনয় নিবেদন?'—বড্ড খাপছাড়া! 'মহাশয়?' —নাঃ! 'শ্রীচরণেষু?'—রামোঃ! শেষে, যে-সম্বোধনটা গোড়াতেই তার মনে হয়েছিল, এবং যেটা বসানোর বিরুদ্ধে সে এতক্ষণ লড়াই করেছিল, সেই সম্ভাষণ দিয়েই পত্র আরম্ভ করলে; এবং তারপর অনেক কাগজ নষ্ট ক'রে, অনেক কাটাকুটির পর সেখানা যখন শেষ করলে, তখন রাত আর বেশী নেই।

মায়া লিখ্‌লে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

যথা-সময়ে আপনার পত্র পেয়েছি। যে-কবিতাটি নরেন-দা'র কাছ থেকে আমি নিয়েছিলাম (নরেন-দা' আমোকে দেন নি, আমি জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছিলাম) সেখানা আমার কাছেই আছে। সেখানা আপনি নষ্ট ক'রে ফেলতে বলেছেন, কিন্তু ভেবে দেখলাম, জোর-ক'রে নেওয়া ও জিনিষটার ওপর আমার সত্যিকার কোন অধিকার নেই; সুতরাং তাকে আমি নষ্ট

করতেও পারি না। তাই, সেখানি এই সঙ্গে আপনাকে ফেরত দিলাম। আশা করি, আপনি কুশলে আছেন।

ইতি—

শ্রীমায়া সেন

পত্রের মধ্যে মায়া কেন যে না বললে ফটো-সম্বন্ধে কোন কথা, না জানালে একটা নমস্কার,—নারী-চরিত্রের অপার দুর্জ্ঞেয়তাই বোধ করি তার একমাত্র কৈফিয়ৎ।

চিঠি শেষ ক'রে, উঠে গিয়ে সে পুনরায় তার ট্রাঙ্ক্‌টা খুলে; তারপর সেই ভাঁজ-করা কাগজখানি বার ক'রে নিয়ে একবার সেখানি প'ড়ে চিঠির সঙ্গে খামের মধ্যে ভ'রে, জল দিয়ে খামের মুখ বন্ধ ক'রে দিলে।

খামখানাকে একটা বই-এর মধ্যে চাপা দিয়ে রেখে সে মাথার শিওরের জানালাটা খুলে দিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। সারা দেহে সে একটা অপরিসীম বিস্তীর্ণ ক্লান্তি অনুভব করছে। অদূরে গাছের পাতায় পাতায় মর্ম্মর-ধ্বনি তুলে হেমন্তের প্রভাতী বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মায়া ধূসর আকাশের পানে তার দুই-চোখ মেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। অপস্রিয়মান অন্ধকারের বুকে যেন আসন্ন বিরহের একটি করুণ বিষণ্নতা!—

সহসা সে চকিত হয়ে উঠ্‌ল,—ইস্! নিজের অজানতে তার গাল দুটো কখন একেবারে ভিজে উঠেছে। আঁচল দিয়ে

মুখটা মুছে ফেলে, অকারণে একটু হেসে, মায়া তার শ্রান্ত দেহ বিছানার ওপর এলিয়ে দিলে।

তিন মাস পরেই এ-আখ্যায়িকার শেষ পরিচ্ছেদের সুরু। সূচনায় এর গতি ছিল যেমন মন্থর, নির্ব্বিকল্প, সমাপ্তির সুর এর বেজে উঠ্‌ল তেমনি ক্ষিপ্র, দ্রুত-লয়ে।

মায়াদের স্কুলের ছাত্রীরা আবার একটি অভিনয়ের আয়োজন করেছে। নরেন রজতকে তার টিকিট দিয়েছে।

অভিনয়ের সন্ধ্যা।

রজত যখন এসে তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসল, তখন যবনিকা উঠ্‌তে বেশী দেরী নেই। নরেন ভাল বেহালা বাজাতে জান্‌তো, তাই এ-সব অভিনয়ের পক্ষে সে ছিল অপরিহার্য্য। তাকে সারাক্ষণ ভিতরেই থাকতে হ'ত।

অভিনয় আরম্ভ হ'ল। রজতের মনে হ'ল, মায়াকে যেন অতিরিক্ত রকম রোগা দেখাচ্ছে। দুই-চোখে তার যেন একটি স্তিমিত অবসাদের অঞ্জন মাখানো। চরণের ছন্দের সঙ্গে আগের মতো তার অন্তরের যোগসূত্র আজ যেন কিছুতেই বাঁধা পড়ছে না। তবুও সে অভিনয়-আসরে মায়াই সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে।

পূর্ব্বাপর

বিরামের ঘণ্টা বাজলো। রজত বাইরে আসবার জন্ম আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় নরেন এসে উপস্থিত হ'ল।

—কখন এসেছ? তোমার জন্ম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। কেমন হচ্ছে?

রজত হেসে বল্লে—অভিনয় আরম্ভ হবার ঠিক আগেই এসেছি। অপেক্ষা ক'রেও আমার দেখা পাও নি জেনে দুঃখিত হলাম। অভিনয় কেমন হচ্ছে, সে-সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করা বাহুল্য। কিন্তু, দেখ নরেন, মায়াকে যেন আজ খুব 'ফিট্' ব'লে মনে হচ্ছে না।

নরেন বল্লে—অভিনয় করছে কী ক'রে, এই আশ্চর্য্য! সকালেও ওর টেম্‌পারেচার ছিল একশোর ওপর; এখনো বোধ হয় জ্বর একেবারে ছেড়ে যায় নি।

রজত বল্লে—এ-ভাবে ওকে নামানো তোমাদের মোটেই উচিত হয় নি।

নরেন বল্লে—তা একশোবার, কিন্তু ও-ই জিদ্ করলে। আমরা অনেক বলেছিলাম। যাক্, শোন,—দেখা করবে? ও দাঁড়িয়ে আছে গ্রীন্-রুমের দরজায়।

রজত ত্রস্ত হয়ে বল্লে—তুমি বলেছ না কি যে, আমি দেখা করতে চাই?

নরেন হেসে বল্লে—না হে না, তা বলি নি। তবে তুমি এসেছো, তা ও জানে।

রজত ইতঃস্তত ক'রে বল্লে—চলো।

দু'জনে বাইরে এসে দাঁড়াতেই নরেন রজতের কাণে কাণে বল্লে—দূরে ওই যে পাকাচুল ভদ্রলোক, উনিই মায়ার মামা। চল, আলাপ করিয়ে দি।

পরিচয় শুনে অধ্যাপক-মহাশয় সোচ্ছ্বাসে ব'লে উঠ্‌লেন—তোমার কথা ত অনেক শুনেছি। তুমি আমাদের ওখানে গিছলে, না? হ্যাঁ। মায়ার কাছে শুনেছি। খুব খুসী হলাম, তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে। এই দেখ দিকি—আমার কি এ-সব পোষায়? শুধু ওই মেয়েটার জন্যে। কিছুতেই কোন বারণ শুনবে না। আজ তিনমাস ধ'রে ক্রমাগত ভুগছে—রোজ অসুখ, রোজ জ্বর। তবুও চলে এলো। কাজেই আমাকেও আসতে হ'ল সঙ্গে। তুমি ডাক্তার হয়েছ বুঝি? খুব ভাল। তোমাকে মাঝে মাঝে আমাদের কাছে পেলে আনন্দিত হব। আচ্ছা, এসো।

গ্রীনরুমের দরজার কাছে এসে দেখা গেল—মায়া সেখানে নেই। আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট-চিত্তে এক-প্লেট্ আইস্-ক্রীমের সদ্ব্যবহার করছে।

নরেন তাকে প্রশ্ন করলে—এই ঝুনু, মায়া কোথায় গেল রে?

ঝুনু তখন মুখ-ভর্ত্তি আইস্-ক্রীম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। গাল ফুলিয়ে কি বলতে চেষ্টা করলে, বোঝা গেল না।

নরেন রজতকে বল্লে—বোধ হয় ভিতরে গেছে। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি ডেকে আনছি।

তারপর ঝুনুর দিকে ফিরে বল্লে—ঝুনু, এ ভদ্রলোককে চিনিস্ ? চিনিস্ নে। ইনি হচ্ছেন রজত রায়, আমার বন্ধু—

আর বলতে হ'ল না, ঝুনু সেই এক মুখ হিম পদার্থ গলার ভিতর চালিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বল্লে—নমস্কার। নরেন-দা', মায়া-দি' মাসিমার কাছে গেছে। সেই ও-ই কোণে।

তারপর রজতের দিকে ফিরে বল্লে—আপনাকে আমরা সব্বাই চিনি। নরেন-দা' আপনার কথা আমাদের কাছে অনেক গল্প করেন। আচ্ছা, সেবারকার চেয়ে এবারের অভিনয় অনেক খারাপ হচ্ছে, না ?

রজত কোন উত্তর দেবার আগেই নরেন মায়াকে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হ'ল। দুই-হাত কপালে ঠেকিয়ে রজত বল্লে—নমস্কার! কেমন আছেন ?

স্বল্প একটু ভঙ্গীতে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে মায়া বল্লে—আমি ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন ?

কণ্ঠস্বরের নিস্পৃহতা অতি বড় অমনোযোগী শ্রোতারও কাণ এড়ায় না।

রজত বল্লে—কিন্তু আপনার মামার মুখে যে শুনলাম—

আগের সুরেই মায়া বল্লে—শুনেছেন বুঝি ? ওটা মামার একটা উইক্‌নেস্। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন কি না, তাই,

যার-তার কাছেই মনের উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে ফেলেন। ঝুনু আমায় একটু আইস্-ক্রীম দিবি নে?

আহত রজত তখন ঝুনুর দিকে ফিরে বল্লে—আপনি বলছিলেন—আজকের অভিনয় তেমন ভাল হচ্ছে না। কতকটা তাই বটে। কিন্তু আপনার পার্ট যা হচ্ছে—চমৎকার! এ রকম স্বাভাবিক এবং আর্টিষ্টিক্ অভিনয় এর আগে দেখি নি বল্লেও হয়,—ওয়াণ্ডারফুল্! সত্যি নরেন, এঁর মধ্যে খুব বড়ো প্রতিভার ছাপ আছে। আগের অভিনয়ে এঁকে তোমরা ভাল পার্ট দাও নি তাই, নইলে সেবারেও ইনি নিশ্চয় আজকের মতোই সব-চেয়ে ভাল করতেন।

বেহারা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘোরাঘুরী কচ্ছে, নরেন বল্লে—রজত, চা খাবে?

রজত ধন্যবাদ দিয়ে জানালে, এমন সময় সে চা খায় না; তারপর ঝুনুর দিকে ফিরে আর এক-দফা তার অভিনয়ের সুখ্যাতি ক'রে মায়ার পানে তাকিয়ে বল্লে—নমস্কার! চল্লাম।

মায়া এবার আর প্রতি-নমস্কার করবার চেষ্টাও করলে না।

রজত আর নরেন ও-ধারের দিকে প্রস্থান করতেই ঝুনু বল্লে—বেশ লোক, না মায়া-দি'? আচ্ছা, তোমার সঙ্গে ত অনেকদিনের চেনা, না? তুমি কিন্তু বাপু মোটেই ভাল ক'রে ওঁর সঙ্গে কথা কইলে না। ভদ্রলোক কী রকম গম্ভীর মুখে চলে গেলেন—আমি দেখেছি। ভিতরে যাই চলো,

এখুনি ড্রপ উঠ্‌বে ;—ও মা, মায়া-দি' ! তোমার জর নিশ্চয় খুব বেড়েছে ; গা যে একেবারে আগুনের মতো হয়ে উঠেছে—

মায়া শ্রান্তকণ্ঠে বল্লে—ও কিছু নয়। তুই অতো বকিস না। চল্।

অভিনয় পুনরায় স্থরু হ'ল। রজতের তেমন মন লাগ্‌ছে না। অন্তরের কোন্ এক অজ্ঞাত প্রদেশে একটা সূক্ষ্ম বেদনার অনুভূতি জেগে উঠে তাকে মহা অস্বস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু এ-বেদনার মূল যে কোথায়, আর তাকে দূর করতে হ'লে কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন,—সে-সম্বন্ধে কোন স্থস্পষ্ট ধারণা সে আয়ত্ত করতে পাচ্ছে না। একবার সে বাড়ী যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল ; পরক্ষণেই আবার আসন গ্রহণ ক'রে রঙ্গমঞ্চের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে।

ইতিমধ্যে অভিনয় শেষের দিকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। মাঝখানে দু'-তিনজনের সঙ্গে মায়ার একখানি গান ছিল, সেখানি বাদ দেওয়া হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ পরে শেষ দৃশ্য এল। সে-দৃশ্যে মায়ার একটি নাচ ছিল—একা। রজত ভেবেছিল, হয়ত এটিও বাদ দেওয়া হবে ;—কিন্তু না, ওই যে দূরে ওধার দিয়ে ধীরে ধীরে মায়া প্রবেশ করছে !—তার পরণের মেঘ-ছায়া-আঁকা শাড়ীর লুটিয়ে-পড়া আঁচলখানি

পূর্ব্বাপর

পশ্চাৎ-পটের আকাশের পাণ্ডুর রঙের সঙ্গে যেন এক হয়ে মিশে গেছে। বহুদূর থেকে গানের সুর ভেসে আসছে—

> ক্লান্ত যখন ফাল্গুন অবসান,
> বরণের মালা শুকায়েছে অকারণে,
> বন মর্ম্মর ঝরা মাধবীর গান
> থেমে গেছে বনে বনে......

রজতের মনে হ'ল, সঙ্গীতের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মধ্যে মায়া যেন আজ নিজেকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিয়েছে। নেপথ্যবাসিনী দিক্-বধুরা মিলন-বিরহের যে করুণ সুর দিকে দিকে সঞ্চারিত ক'রে দিচ্ছে, মায়ার মধ্যে সে-সুর যেন মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। বর্ষণ-সিক্ত শেফালির মতো তার অন্তরের বেদনা অশ্রান্ত-ধারায় ঝ'রে পড়ছে—তার অবসন্ন দেহ-ভঙ্গিমায়, তার শ্রান্ত চরণ-বিক্ষেপে।

ধীরে ধীরে গান শেষের কলিতে এসে দাঁড়াল; কিন্তু মায়া আজ আর থামতে চাইছে না। যে-বিরহগাথার সঙ্গে তার নাচের ছন্দ সে এক-ক'রে গেঁথে দিয়েছে, তারই মধ্যে সে যেন বিলীন হয়ে যেতে চায়।

কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে যখন যবনিকা নেমে এল, তখন দূর-হ'তে-দূরান্তরে-মিলিয়ে-যাওয়া গানের শেষ-ঝঙ্কারের সঙ্গে মায়ার তনু-বল্লরী আশ্রয়-চ্যুত লতার মতোই লুটিয়ে পড়েছে!

প্রস্থানরত মুগ্ধ দর্শক-মণ্ডলীর হর্ষ-ধ্বনিতে প্রেক্ষাগার মুখর হয়ে উঠ্‌ল। সবার শেষে রজত বাইরে এসে দাঁড়াতেই নরেন ব্যস্ত হয়ে এসে তাকে একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বল্লে —ওহে, শীগ্‌গির চলো গ্রীনরুমে। মায়া ষ্টেজের ওপর ফেণ্ট্‌ হয়ে গেছে।

রজত অস্ফুটস্বরে বল্লে—সে কী!

নরেন বল্লে—আর সে কী! এখন, তোমর aid দরকার। চলো ভিতরে।

রজতকে নিয়ে নরেন ভীড় ঠেলে যখন ষ্টেজের মধ্যে প্রবেশ করলে, তখনো মায়ার মূর্চ্ছা ভাঙে নি।

ডাক্তার এসেছে শুনে সবাই অনেকটা আশ্বস্ত হ'ল। ভীড় দেখে রজত বল্লে—সর্ব্বপ্রথম আপনাদের এখান থেকে তফাতে যাওয়া দরকার। ওঁর পক্ষে হাওয়া এখন বড্ড বেশী দরকারী। সেটাকে সবাই মিলে বন্ধ করবেন না।

তারপর নরেনের দিকে ফিরে বল্লে—দেখ, ভিতরে আসবার সময় দেখলাম, একটা ঘরে চা তৈরী হচ্ছে। চট্‌ ক'রে এক কাপ দুধ নিয়ে এসো,—খুব গরম কিন্তু।

কৌচের ওপর মায়ার দেহ শায়িত রয়েছে। চোখ দু'টি মুদ্রিত। রক্ত-হীন পাংশু মুখ। কৌচের ধারে এক হাঁটু মাটিতে পেতে রজত বসল; তারপর মায়ার শিথিল বাঁ-হাতের মণিবন্ধটি নিজের ডান হাতের আঙুলের মধ্যে তুলে নিলে।

মায়ার শিয়রে ব'সে যে-মেয়েটি তার মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল, তাকে নিম্নকণ্ঠে বল্লে—অমন ক'রে নয়, গ্লাসের মধ্যে যে বরফের টুক্‌রোটা রয়েছে, সেইটে নিয়ে ওঁর কপালে আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিন।

নরেনের পিছনেই অধ্যাপক-মহাশয় এসে দাঁড়ালেন। একবার মায়ার পানে তাকিয়ে রজতকে উদ্দেশ ক'রেই যেন বল্লেন—এমনি একটা কিছু যে ঘটবে, তা আমি আশঙ্কা করেছিলাম। Anything serious ?

রজত তাঁর পানে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালে—না।

নরেন রজতের কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলে—জ্ঞান হয়েছে ?

রজত সম্মতি-জ্ঞাপক ইঙ্গিত করলে। মায়ার হাতখানি তখনো তার হাতের মধ্যে ধরা।

কিছুক্ষণ পরে মায়া ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলে; তারপর উঠে বসতে গিয়ে দেখ্‌লে—তার একখানা হাত অপর একজনের অধিকারভুক্ত হয়ে রয়েছে। সে বিস্মিত হয়ে গেল। ব্যাপারটাকে সে এখনো সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পাচ্ছে না। এরা এখানে কি করছে ? অভিনয় কি এখনো শেষ হয় নি ? অভিনয়ের কথা স্মরণ হ'তেই সব কথা ছবির মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল্‌।

নাচের শেষ দিক্‌টায় তার সর্ব্ব-শরীর কে যেন সজোরে

দুলিয়ে দিচ্ছিল। কান্নার মতো কিসের আবেগে তার গলা যেন বুজে আসতে লাগল। চোখের সামনে ফুট্-লাইটের আলোগুলো দূর থেকে বহুদূরে চলে গেল। তারপরেই তার মনে হ'ল—যেন তার ভারী ঘুম পাচ্ছে!

মায়া উঠে বসতেই রজত নরেনের কাছ থেকে কাপ্টা নিয়ে তার দিকে ফিরে বল্লে—এইবার এই দুধটুকু খেয়ে ফেলুন দেখি।

মায়া চোখ মেলে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে; তারপর কাপ্টা ধরবার জন্য হাত বাড়ালে। কিন্তু রজতের হাত থেকে সেটা নিতে গিয়ে তার হাত কেঁপে উঠ্ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দুধ তার পিরাণের হাতায় ছিট্কে পড়ল। রজত তখন নিজের হাতেই পাত্রটা তার মুখের কাছে ধরলে। একবার একটু ইতস্ততঃ ক'রে মায়া দুধের বাটিতে মুখ দিলে।

দুধ খেয়ে তার দুর্ব্বলতা যেন অনেকখানি কেটে গেল। এ-ধারে চোখ পড়তেই সে ব'লে উঠ্ল—সুধা, তুই? আছিস তা হ'লে এখনো!

পরক্ষণেই দু'হাত বাড়িয়ে মায়া তার সেই সেবারতা সঙ্গিনীটিকে নিজের কাছে টেনে নিলে।

সুধা মায়ার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লে—কী ভয়ই যে হয়েছিল ভাই, সে আর কি বলব! ভাগ্যিস রজত বাবু এলেন!

মায়া মৃদু হেসে বল্লে—তাই না কি। তোদের বুঝি খুব ভয়

হয়েছিল? আমি কিন্তু খুব আরাম ক'রে খানিকটা ঘুমিয়ে নিলাম। এতো ভাল লাগছিল! আচ্ছা সুধা, আমি সত্যিই জেগেছি ত?

কথাটা রজতের কাণে গেল। মায়ার মুখের দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে সে বল্লে—জেগেছেন বৈকি। এখনো কি আপনার সন্দেহ আছে?

কথা শুনে মায়ার পাণ্ডুর মুখের ওপর দিয়ে ক্ষীণ রক্তোচ্ছ্বাস ব'য়ে গেল। একবার রজতে পানে তাকিয়েই সে তার মুখ নামিয়ে নিলে।

অধ্যাপক-মহাশয়ের অনুরোধে মায়ার চিকিৎসা করবার জন্ত পর পর কয়েকদিনই রজতকে তাঁর বাড়ীতে যেতে হয়েছিল। উল্লিখিত ঘটনার পর, দিন-দুই মায়া অতিশয় দুর্ব্বল হয়েছিল; অধ্যাপক-মহাশয়েরও উদ্বেগের অবধি ছিল না। প্রথম দিন রোগী দেখে গাড়িতে ওঠার সময় তিনি রজতকে তার ভিজিট্‌ দিতে গিয়েছিলেন; রজত তাঁকে প্রণাম ক'রে বলেছিল—আমি আপনার সন্তান-তুল্য, আমাকে এমন ক'রে লজ্জা দেবেন না।

এর-পর তিনি ও বিষয়ে তাকে আর কোন কথাই বলতে পারেন নি।

রজত প্রত্যহই আসতো; রুগী দেখতো, এবং তারপর অধ্যাপক-মহাশয়ের সঙ্গে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নানা আলোচনায়

যোগদান করত। তিনি এই নম্র-প্রকৃতি ছেলেটির চমৎকার ব্যবহার এবং বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতে আরম্ভ করেছিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই রজতের চিকিৎসার গুণে মায়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল।

সপ্তাহখানেক পরের কথা।

মায়া তার ঘরের জানালার ধারে একখানা বই হাতে ক'রে বসেছিল। দূরে গাছের মাথায় মাথায় অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রাঙা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। বই পড়তে মায়ার মোটেই ভাল লাগছে না। সে কোথাও ফাঁকা জায়গায় গিয়ে অনেকক্ষণ অবধি বেড়িয়ে বেড়াতে চায়। এমন অনভ্যস্ত বন্দী-জীবন তার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক-মহাশয় ঘরে প্রবেশ করতেই মায়া ব'লে উঠল—মামা, চলো,—মাঠের ধারে বেড়িয়ে আসবো।

মামা স্মিত-হাস্যে বল্লেন—না মা, আজ থাক; এখনো তুমি দুর্ব্বল আছ। রজত আসুক। তাকে জিজ্ঞেস্ ক'রে তারপর তোমায় নিয়ে যাব।

মায়া মুখ ভার ক'রে বল্লে—কেন, আমি ত বেশ সেরে উঠেছি। কবে একটু অসুখ করেছিল, তার জন্যে চিরদিন এমনি বন্ধ হয়েই থাক্‌বো না কি?

এমন সময় বাইরে রজতের আসার সাড়া পাওয়া গেল। অধ্যাপক-মহাশয় তাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা ক'রে ভিতরে নিয়ে এলেন, তারপর মায়ার পানে তাকিয়ে রজতকে বল্লেন—ওহে ডাক্তার, তোমার patient ত আজ বেড়াতে যাবার জন্মে ভয়ানক বায়না নিয়েছেন; বলছেন, কবে কোন্ যুগে একটু অসুখ করেছিল তার জন্য তোমরা আমায় চিরকালের মতো solitary imp::isonment দিতে চাও না কি ?

রজত হেসে বল্লে—না, সে রকম ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। উনি প্রায় সম্পূর্ণই সেরে উঠেছেন, আজকের নতুন prescriptionটা যদি খাটে, তা হ'লে কাল যত ইচ্ছে বেড়িয়ে আসবেন—আপত্তি নেই।

আরও দু'-চার কথার পর অধ্যাপক-মহাশয় প্রস্থান করলেন; এবং তারপর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী এবং ডাক্তার দু'জনেই নীরব হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে মায়া মুখ ফিরিয়ে রজতের পানে তাকালে, —অন্যমনস্ক হয়ে সে যেন গভীরভাবে কি চিন্তা করছে। ধীরে ধীরে মায়া বল্লে—কৈ, কি প্রেসক্রিপ্শান লিখ্বেন, লিখুন! কালকে আমি কিন্তু বেড়াতে যাবই।

রজত সজাগ হয়ে উঠ্ল; তারপর মায়ার চোখের ওপর চোখ রেখে সে বল্লে—আজকের prescription আর কাগজের ওপর লিখবো না।

মায়া চকিত হয়ে জানালার বাইরে তার মুখ ফিরিয়ে নিলে। হয়ত সূর্য্যের আলো পড়েই ওর মুখখানি অতটা রাঙা দেখাচ্ছে। রজত সে মুখের পানে বহুক্ষণ অতৃপ্ত-নয়নে তাকিয়ে রইল। তারপর গভীর স্বরে বল্লে—দেখুন, আজ আর আমি ডাক্তারি করতে আসি নি। আজ আপনাকে আমার একটি কথা বলবার আছে। সেটি প্রকাশ করবার অনুমতি চাই।

বহুক্ষণ থেকে মায়ার মনে এমনি একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কা উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল; এইবার তার বুক স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌ল। আজ সে যেন একান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। প্রতিরোধ করবার শক্তি যেন তার ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসছে। ক্ষীণকণ্ঠে সে বল্লে—বলুন।

তখন রজত অনেক দ্বিধা অনেক ভূমিকার পর তার সেই একটি কথা মায়ার কাছে নিবেদন করলে।

ক্রমে পশ্চিমাকাশের অস্তরাগ অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল। পৃথিবীর বুকে গোধূলির লগ্ন আসন্ন হয়ে এল। চাকর এসে ঘরের আলো জেলে দিয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান কর্‌ল। ঘরের ভিতরকার অধিবাসী-দু'টী পরস্পরের কাণে তখনো হয়ত অনাদি-কালের সেই একটা কথাই গুঞ্জরণ ক'রে চলেছে।

পূর্ব্বরাগ

সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। মীনদ্বীপের উপর দিয়া দিগন্তের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত কুয়াসার ঘন আস্তরণ বিস্তীর্ণ। সাগর-তীরের ছোট ছোট গ্রামগুলি স্তব্ধ, আচ্ছন্ন। নিঃসীম অম্বুধি ঘুমন্ত শিশুর মতো শান্ত স্থির হইয়া পড়িয়া আছে।

সমুদ্রের কিনারায় পাহাড়ের ধারে ধারে জেলের দল শীতের প্রকোপ উপেক্ষা করিয়া ইহারই মধ্যে কাজে লাগিয়া গেছে।—কেহ বা জাল টানিয়া তুলিতেছে, কেহ বা খেয়া-নৌকা ভাসাইয়া যাত্রীর অপেক্ষা করিতেছে, কেহ বা নৌকা ধুইয়া-মুছিয়া পরিস্কার করিতেছে। তাহাদের কর্ম্ম-চঞ্চলতা নিঝুম প্রকৃতিকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

নগরের পুরোহিত আসিয়া মাঝি শ্রীমন্তের নৌকায় উঠিলেন। একবার আকাশের পানে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া মাঝিকে প্রশ্ন করিলেন—শ্রীমন্ত, আজকে কি আকাশ সারাদিন এমনি পরিস্কার থাকবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ; সূর্য্য উঠ্‌লেই কুয়াসার ঘোর কেটে যাবে। আপনার কোন চিন্তা নেই।

পুরোহিত নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন—তা হ'লে তার দেরী কি ? যাত্রা করা হোক্।

শ্রীমন্ত নৌকা ছাড়িতে ইতঃস্তত করিতেছে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বিলম্ব কিসের ?

শ্রীমন্ত সম্মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—আর-একজন যাত্রী আসচে। সে-ও কর্পূর-নগরে যাবে। অবশ্য আপনার অনুমতি ছাড়া তাকে আমি নৌকায় নিতে পারবো না। ওই যে—

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পুরোহিত সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ যে শীলা! কর্পূর-নগরে ওর কি প্রয়োজন ?

শ্রীমন্ত মাথা নাড়িল। সে জানে না।

ক্ষিপ্র-পদে একটি অনতি-যৌবনা ক্ষীণাঙ্গী তরুণী নৌকার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পুরোহিত বলিলেন—সুপ্রভাত শীলা। তুমি কি আমাদের সঙ্গে কর্পূর-নগরে যাবে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

—শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা কর। নৌকা ওর।

শীলা পুরোহিতের প্রতি তাকাইয়া বলিল—আমার কাছে কিন্তু চারটির বেশী পয়সা নেই ;—এতে কি যাওয়া যাবে ?

শ্রীমন্ত বলিল—আমার চাই না। ও তুমিই রেখে দাও।

কতকগুলি কাঠের বাক্স সরাইয়া সে শীলার বসিবার স্থান করিয়া দিল।

মাঝির কথার উত্তরে তরুণী ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিল—আমি অমনি যেতে চাই নে।

পুরোহিত সস্মিত মুখে বলিলেন—এস এস শীলা! শ্রীমন্ত ছেলেটি খুব ভাল; না-হয় বিনি-পয়সায় তোমায় পার ক'রে দিলে। এস, উঠে এস।

এই বলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া বলিলেন—বোসো এইখানে;—দেখ, এরই মধ্যে শ্রীমন্ত ওর নতুন র‍্যাপারখানা তোমার জন্যে পেতে দিয়েছে।—না শ্রীমন্ত, এতে লজ্জা পাবার কিছুই নেই; জগতের এই নিয়ম। আঠারো বছরের তরুণীর জন্যে একজন যুবক যে আত্মত্যাগ করতে পারবে, ততখানি সে আর-কারুর জন্যেই পারবে না;—সৃষ্টির আদিম দিন থেকে এই স্বাভাবিক নিয়মই চ'লে আসচে।

ততক্ষণে শীলা নৌকায় উঠিয়া, শ্রীমন্তের গাত্রবস্ত্রখানি এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া পুরোহিতের সম্মুখে বসিয়া পড়িয়াছে।

শ্রীমন্ত তাহা লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর মুখে নৌকা চালাইয়া দিল।

পুরোহিত এবং তরুণীর মধ্যে তখন কথোপকথন চলিতে লাগিল:

—তোমার ছোট্ট পুঁটুলিতে কি আছে শীলা?

—পশম এবং সুতো। শহরে দু'জন খদ্দের আছে; তাদের বিক্রি করব।

—সুতো কি তুমি নিজে কেটেচ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার মা কেমন আছেন?

—দিন দিন খারাপের পথেই চলেচেন। জীবনের আশা অত্যন্ত কম।

অন্যান্য সাংসারিক কথার পর পুরোহিত কহিলেন—তোমার বিবাহের কি হ'ল?—সে শিল্পীর কি আর কোন খবর নেই?—তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করলে কেন?

লীলা উত্তর করিল—তা না করলে সে আমায় বিয়ে ক'রে ভয়ানক যন্ত্রনা দিত,—হয়ত বা আমায় মেরেই ফেল্‌তো।—

স্নিগ্ধকণ্ঠে পুরোহিত বলিলেন—না না, সে কি! কখনো ও-সব মন্দ চিন্তা মনে স্থান দিও না। জানো না, তুমি ভগবানের আশ্রিতা—তাঁর ইচ্ছার ব্যতিরেকে তোমার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারে না? তা ছাড়া, আমি জানি, সে-ছোকরা খুব সৎ এবং ভদ্র—

লীলা আত্মগতভাবে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—আমার স্বামীর দরকার নেই,—বিবাহ আমি করব না, কখনো... ...

—বিবাহ করবে না! এ-জগতে তুমি একাকী, রক্ষকহীন জীবন-যাপন করবে? তা কখনো হয়! আর, কেনই বা বিবাহ করবে না?... ...উত্তর দাও।

লীলা ইতঃস্তত করিতে লাগিল।

পুরোহিত প্রশ্ন করিলেন—আমার কাছে বল্‌তেও কি তোমার সঙ্কোচ বা আপত্তি আছে ?

শীলা মাথা নাড়িল ; এবং পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনমুখে তাঁহার প্রতি চাহিল। তিনি বুঝিলেন—নৌকায় অন্য লোক থাকাতে সে দ্বিধা করিতেছে। তিনি তাহার আরও নিকটে সরিয়া বসিলেন। শীলা তখন, অন্যে না শুনিতে পায় এমনি মৃদুকণ্ঠে তাহার জীবনের কাহিনী বলিতে লাগিল—

কেমন করিয়া তাহার পিতা প্রতিরাত্রে মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিয়া মায়ের উপর অত্যাচার করিত ; কেমন করিয়া মায়ের গোপন-সঞ্চিত সামান্য অর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি অলঙ্কার, এমনি কি ভাল ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ-গুলিও তাহার পিতা কাড়িয়া লইয়া যাইত ; কেমন করিয়া তাহার মা নীরবে স্বামীর সকল প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ভিতরে ভিতরে ভাঙিয়া পড়িতেছিলেন—

নারীর প্রতি পুরুষের নির্ম্মম নিপীড়নের সুদীর্ঘ সকরুণ ইতিহাস !

কাহিনী শেষ করিয়া শীলা বলিল—বাবা মারা যাবার সময় মা তাঁর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছিল বটে, কিন্তু তাঁর আচরণে সমস্ত পুরুষ-জাতটার ওপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে ; মনে হয়, সকলের প্রকৃতিই বুঝি অমনি নৃশংস। সেই জন্যেই ঠাকুর, আমি জীবনে কোন পুরুষের কবলে যেতে চাই না।

নৌকা আসিয়া নগরের ঘাটে লাগিল। পুরোহিত নৌকা হইতে নামিয়া শীলাকে বলিলেন—তুমি একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো।

তারপর শ্রীমন্তকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—আমি বোধ হয় এ-বেলা আর ফিরতে পারবো না ; অবশ্য শীলা শীঘ্রই ফিরবে। তুমি ওর জন্য অপেক্ষা কোরো।

—আমি দুপুর অবধি থাকবো ; এর মধ্যে যদি তুমি আস... ...

শীলা তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়াই নগরের অভিমুখে চলিতে লাগিল।

কিছুদূর আসিয়া সে পথের বাঁকের মুখে পড়িল। ভিন্নদিকে যাইবার পূর্ব্বে পিছনের দিকে বারেকের জন্য চক্ষু ফিরাইতেই শীলা দেখিল, মুখের উপর অপরিসীম বেদনার ছায়া লইয়া শ্রীমন্ত তাহারই পানে দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

শীলা যখন সমুদ্রতীরে ফিরিয়া আসিল, তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ প্রায়। কুয়াসা কাটিয়া গিয়া প্রখর রৌদ্র-কিরণে জল-স্থল উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বালুবেলা জনশূন্য।

শ্রীমন্ত ইতিমধ্যে নগরের ভিতর গিয়া আহার সমাধা করিয়া আসিয়াছিল। সস্তাদরে গোটাকয়েক কমলালেবু কিনিয়া আনিয়া সেগুলি নৌকার একপাশে ছোট একটি কাঠের বাক্সের ভিতর রাখিয়া দিয়া সে শীলার অপেক্ষায় বসিয়াছিল।

শীলা আসিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নৌকায় উঠিয়া বসিল। শ্রীমন্ত মৌনমুখে নৌকা ভাসাইয়া দিল।

শীলা নৌকার অপরদিকে পাশ ফিরিয়া বসিয়াছিল। শ্রীমন্ত তাহার মুখের একদিক মাত্র দেখিতে পাইতেছিল,—দ্বিপ্রহরের খরতাপে তাহা রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুকাল নীরবে নৌকা চালাইবার পর সে দাঁড় বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিয়া লেবুর টুক্‌রিটা বাহির করিল, এবং শীলার দিকে তাহা আগাইয়া দিয়া বলিল—দু'-একটা খাও; তেষ্টা ভাঙ্‌বে'খন। বড্ড গরম; আমাদের যেতে হবে বড় কম খানি ত নয়!

—তুমি খাও। আমার দরকার নেই।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শ্রীমন্ত পুনরায় বলিল—তোমার মায়ের জন্য গোটাকয়েক নিয়ে যেও। শুনলাম, তাঁর খুব অসুখ।

—বাড়ীতে আমাদের লেবু আছে, আরি বাজারও কাছেই; তা ছাড়া মা ত তোমায় চেনে না যে, তোমার দেওয়া জিনিষ তাঁকে দেব।

—বেশ ত। তুমি আমার পরিচয় তাঁর কাছে দিয়ে দিও।

—আমি? আমিও ত তোমায় চিনি না।

শ্রীমন্ত আর কোন কথা বলিল না।—রাগে, অপমানে, দুঃখে তাহার সর্ব্ব-শরীর জ্বালা করিয়া উঠিল;—শীলা তাহাকে চেনে না? মিথ্যাবাদী! যতদিন তাহারা এইখানে আসিয়াছে ততদিন ধরিয়া শ্রীমন্ত তাহার মনস্তুষ্টির জন্য শত-সহস্ররূপে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে;—আর আজ শীলা তাহাকে চেনে না? শ্রীমন্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভিতরে ভিতরে ফুলিতে লাগিল।

অনুকূল বাতাসে তরণী ভাসিয়া চলিল। চারিদিকে অটুট নিস্তব্ধতা। কেবল শ্রীমন্তের সবল হস্ত-নিক্ষিপ্ত দাঁড়ের শব্দ সেই নীরবতার মধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এমনি করিয়া কাটিয়া গেল, তারপরেই সহসা শ্রীমন্ত দাঁড় বন্ধ করিয়া আবেগ-উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আজ এর একটা নিষ্পত্তি ক'রে ফেলতে চাই আমি, শীলা! কেন তুমি আমায় এতখানি অবহেলা কর? আমার মনের কথা অনেক দিন থেকেই তুমি জান, তবে কেন বারবার আমায় এমন ক'রে অপমান কর?

শীলা অকম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিল—অপমান কখনো তোমায় করি নি; কেবল জানিয়ে দিয়েছি, কোনও দিন আমি তোমায়

স্বামীত্বের আসনে বরণ ক'রে নিতে পারবো না ;—কারুকে কোনদিনই পারবো না।

—কেন পারবে না ?

—এ কথা জিজ্ঞাসা করবার তোমার কোন অধিকার আছে ব'লে মনে করি না।

—অধিকার নেই ?

শ্রীমন্তের কথার ভাবে শীলা মনে মনে চমকিয়া উঠিল ; তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল একটা ক্রুর বিষাক্ত হাসিতে তাহা কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষিপ্ত-কণ্ঠে শ্রীমন্ত বলিয়া উঠিল—আমার জীবনটাকে কিছুতেই এমন ক'রে ব্যর্থ হ'তে দিতে পারবো না ; আমি আজ এইখানে এই মুহূর্ত্তে আমার অধিকারের প্রতিষ্ঠা করব। তুমি এখন সম্পূর্ণ আমার মুঠোর মধ্যে, সেটা বোধ হয় আর তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে না ?

শীলা চকিত হইয়া তাহার ক্রুদ্ধ বিবর্ণ মুখের প্রতি তাকাইল ; বুঝিল, শান্তশিষ্ট শ্রীমন্তের ভিতর হইতে আজ সহসা যে উন্মত্ত পশু জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা তাহার পক্ষে হয়ত সহজ হইবে না।—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে নির্ভীক-স্বরে উত্তর দিল—হ্যাঁ জানি ; এখন আমি সম্পূর্ণভাবে তোমার কবলে ; তুমি এখন ইচ্ছে করলে আমায় মেরে ফেলতেও পারো ; কিন্তু তবুও—

—হ্যাঁ পারি। কোন কাজ অসম্পূর্ণভাবে করা আমার রীতি নয়। এ বিশাল সমুদ্রের মধ্যে দু'জনের স্থান যথেষ্ট আছে; দু'জনে একসঙ্গে ওরই অতলে মায়াপুরীর সন্ধানে যাত্রা করব—আজ, এখুনি!

এই বলিয়া সে ক্ষিপ্ত পশুর মত লাফাইয়া গিয়া শীলার হাত ধরিয়া তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিল!

মুহূর্ত্ত মাত্র!—

তারপরেই একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া শ্রীমন্ত তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল,—তাহার ডান-হাতের মণিবন্ধের কাছ হইতে ঘন রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল! শীলা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণ শক্তিতে তাহার হাতের উপর দাঁত বসাইয়া দিয়াছিল।

—তোমার অধিকারে আমি!—কোনদিন না। কথার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষ মধ্যে সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ক্ষণকালের জন্য শ্রীমন্তের বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল; পরক্ষণেই সচেতন হইয়া দেখিল—শীলা তাহার দেহ ভাসাইয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে সাঁতার কাটিতেছে।

ক্ষিপ্রহস্তে দাঁড় তুলিয়া লইয়া শ্রীমন্ত তাহার দিকে নৌকা চালাইয়া দিল। ক্ষতস্থান হইতে অজস্র-ধারায় রক্ত ঝরিতে লাগিল।

শীলার পাশে নৌকা লইয়া গিয়া কাতরকণ্ঠে সে বলিল—

ভগবানের দোহাই শীলা, নৌকায় ওঠ! আমার মাথার ঠিক ছিল না তাই তোমায় অপমান করতে উদ্যত হয়েছিলাম। তার জন্যে আমায় ক্ষমা করতেও হবে না; শুধু নৌকায় উঠে নিজের জীবন রক্ষা কর। এখান থেকে ঘাট অনেক দূরে; অমন ক'রে পারবে না।—উঠে এস।

শীলা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর নৌকা ধরিল।

দুইজনে আবার নীরবে বসিয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। শীলা নৌকায় উঠিবার সময় নৌকা এক-পাশে হেলিয়া গিয়া শ্রীমন্তের র‍্যাপারখানা জলে পড়িয়া গিয়াছিল।

অন্যের দৃষ্টি এড়াইলেও শীলা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল।

গা মুছিতে মুছিতে সহসা নৌকার তলদেশে দৃষ্টি পড়িতেই শীলা চমকিয়া উঠিল—কাঁচা-রক্তে সে-স্থানটা লাল হইয়া উঠিয়াছে! পরক্ষণেই চোখ তুলিয়া শ্রীমন্তের হাতের প্রতি তাকাইয়া সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। তাহার অন্তরের মধ্যে সহসা একটা তীব্র অনুশোচনার অনুভূতি জাগিয়া উঠিল।

নিজের যে রেশমের গাত্রবস্ত্রখানি দিয়া সে গা মুছিতেছিল,

সেখানি শ্রীমন্তের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—এইখানা নাও; হাতটা বাঁধ।

শ্রীমন্ত ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইয়া নৌকা চালাইতে লাগিল।

কিছুকাল নীরবে কাটিয়া গেলে পর শীলা উঠিয়া আসিয়া শ্রীমন্তের পাশে বসিল, বোধ করি বারেকের জন্য দ্বিধা করিল, পরক্ষণেই শ্রীমন্তের বিক্ষত হাতখানি নিজের কোলের উপর টানিয়া লইয়া ওড়নাখানি পাট করিয়া তাহার হাত বাঁধিয়া দিতে লাগিল। দুই-একবার ক্ষীণ প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া শ্রীমন্ত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

নৌকা ততক্ষণে ঘাটের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শ্রীমন্ত নিজের শয়ন-কক্ষের খোলা জানালার ধারে বসিয়াছিল। রাত্রিকাল। অদূরবর্ত্তী সমুদ্রের দিক হইতে শীকর-বাহী আর্দ্র বাতাস ভাসিয়া আসিয়া তাহার চুলের মধ্যে খেলা করিতেছিল। ঘন-বর্ষার আকাশের মতো তাহার মুখের উপর যেন একটি গভীর অবসাদের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে।

শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চোখ মেলিয়া সে সকালের ঘটনার কথাই ভাবিতেছিল... ...

শীলা ঠিকই বলিয়াছে; সে একটা জানোয়ার। তাহার উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে। কাল সকালেই শ্রীমন্ত তাহার ওড়না ফিরাইয়া দিবে;—আর কোন দিনও সে তাহাকে তাহার সুমুখে দেখিতে পাইবে না ... ...

সহসা বাড়ীর দরজায় কাহার পায়ের সাড়া পাইয়া শ্রীমন্ত ফিরিয়া চাহিল। মুহূর্ত্ত পরেই শীলা আসিয়া তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বিস্মিত শ্রীমন্ত নিম্নস্বরে বলিল—তোমার ওড়না নিতে এসেচো? কষ্ট ক'রে আসবার দরকার ছিল না। কাল সকালেই কারুকে দিয়ে নিশ্চয় পাঠিয়ে দিতাম।

অধীর-কণ্ঠে শীলা বলিল—না, না, তার জন্যে নয়। পাহাড়ের ওপর থেকে বেদেদের দিয়ে এই সব পাতা পাড়িয়ে নিয়ে এসেচি;—এতে তোমার ঘা শীগ্‌গিরই সেরে যাবে। এই দেখ।

সে তাহার হাতের চুবড়িটার ডালা খুলিয়া কতকগুলি গাছের পাতা বাহির করিল।

স্নিগ্ধ-কণ্ঠে শ্রীমন্ত বলিল—এত কষ্ট স্বীকার করবার কি দরকার ছিল,—আমি বেশ ভালই আছি। আর এই যে সামান্য আঘাত, এ ত আমার উচিৎ পাওনাই পেয়েছি। তার জন্যে এমন অসময়ে তোমার আসবার ত কিছু প্রয়োজন ছিল না। একে ত লোকে না জেনে কত কথাই বলে—

শীলা ক্ষুদ্র একটি গ্রীবাভঙ্গী করিয়া কহিল—বলুক, তাদের আমি গ্রাহ্য করি নে। আমি তোমার হাত দেখতে এসেছি, আর এই পাতাগুলো তোমার হাতে লাগিয়ে দিতে এসেছি। বাঁ-হাত দিয়ে ভাল ক'রে এ-গুলো লাগাতে পারা যাবে না।

—ওষুধের কিছু আবশ্যক নেই। হাত আমার এমনিই ভাল আছে।

—কই, দেখি তোমার হাত...ও মাগো! বল্‌ছ আবশ্যক নেই? এ যে বড্ড ফুলে উঠেছে!

—না না, বেশী কিছু নয়। ও-টুকু ফুলো দু'দিনেই সেরে যাবে।

শ্রীমন্তের শেষ-কথায় কর্ণপাত না করিয়া শীলা ক্ষিপ্রপদে একটা পাত্রে জল ভরিয়া আনিল। তারপর তাহাকে বিছানার উপর বসাইয়া, নিজে সম্মুখের একটা নীচু চৌকিতে বসিয়া নিপুণা শুশ্রূষাকারিণীর মতো পরম যত্নে তাহার ক্ষত-স্থান ধুইয়া দিতে লাগিল। শ্রীমন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শান্ত বালকের ন্যায় বসিয়া রহিল।

হাত বাঁধা হইয়া গেলে পর একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ শীলা। আমায় আর একটি দয়া কর—আমায় তুমি ক্ষমা কর। সকালে আমি যা করেছি, যা বলেছি,—দয়া ক'রে ভুলে যাও। কেমন ক'রে কী যে হ'ল তা আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারি নি।—কিন্তু তোমার যে কোন

দোষ ছিল না, তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। যাই হোক্, ভবিষ্যতে কোন দিন তুমি আমার মুখ থেকে বিরক্তিকর কোন কথা শুন্‌তে পাবে না। আমায় তুমি ক্ষমা কর।

বারবার শ্রীমন্তের কোমল-কণ্ঠের ক্ষমা প্রার্থনায় শীলা অধীর হইয়া বলিল—কেন তুমি অত ক'রে বল্‌ছ—দোষ ত আমারই! আমারই তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। তোমার সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার না করলে ত কিছুই ঘট্‌ত না। তারপর তোমাকে অমন ক'রে—

শ্রীমন্ত কহিল—নিজেকে বাঁচাবার জন্যে যা করেছিলে,—সে ঠিকই করেছিলে। আমার পশুত্বকে বিনাশ করয়া ঠিক অত-খানিরই প্রয়োজন ছিল। ক্ষমা চাইবার কথা মুখেও এনো না। তুমি আমার যে উপকার করলে ধন্যবাদ দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করা যাবে না; সুতরাং সে-চেষ্টাও করব না।—এই নাও তোমার ওড়্‌না।

শ্রীমন্ত উঠিয়া আসিয়া সেখানি পাট করিতে শীলার হাতে দিতে গেল, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে শীলা ইতঃস্তত করিতে লাগিল;—তাহার মনের মধ্যে যেন কিসের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে; তাহাকে সে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না—!

অবশেষে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটি ছোট্ট সুন্দর রূপার ফুলদানি বাহির করিয়া বলিল—আমার দোষে তোমার র‍্যাপারখানা গেছে। তার দাম ত এখন আমি দিতে পারবো

না। তার বদলে তুমি এইটি নাও—এইটে বিক্রি ক'রে—

তাহার কথার মাঝেই শ্রীমন্ত বলিয়া উঠিল—কিছুতেই ও আমি নেব না।

—কেন নেবে না? আমি ত তোমায় উপহার ব'লে কিছু দিচ্ছি না। আমি তোমার যা ক্ষতি করেছি তারই পূরণ-স্বরূপ—

কিন্তু শ্রীমন্তের বিহ্বল বেদনাতুর মুখের প্রতি চাহিয়া শীলা তাহার কথা শেষ করিতে পারিল না; নতমুখে মাটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

করুণ, কোমলকণ্ঠে শ্রীমন্ত বলিতে লাগিল—শীলা, তুমি বাড়ী যাও; তুমি আজ আমার জন্যে যে-কষ্ট স্বীকার করেছ, সে-কথা আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করব; কিন্তু তোমার জিনিষ আমি নিতে পারবো না। রাত্রি হয়েছে, এখুন তুমি বাড়ী যাও; জেনে যাও, আর কোনদিন শ্রীমন্ত তোমার বিরক্তি উৎপাদন করতে তোমার সামনে ... ... এ কী! শীলা, তুমি কাঁদছ—?

শ্রীমন্তের কথা শেষ হইল না, শীলা তাহার পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আর্দ্র-কণ্ঠে বলিতে লাগিল—আমি যে আর সইতে পারচি না; ওগো! কেন তুমি আমায় এমন ভাল ক'রে বলছ! কেন আমায় চলে যেতে বলছ? আমি তোমার ওপর অন্যায় করেছি, আমি তোমায়

যন্ত্রণা দিয়েছি ;—তুমি আমায় শাস্তি দাও, আমায় পীড়ন কর, আমায় দলিতমথিত ক'রে উপযুক্ত দণ্ড দাও! আর, আর... শীলার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল—যদি তুমি আমায় এখনো ভালবাস, তা হ'লে আমায় নাও, আমার ওপর তোমার যথেচ্ছা অধিকার বিস্তার কর ;—শুধু এমন ক'রে আমায় এখান থেকে চলে যেতে ব'ল না—

অশ্রুর আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তকাল শ্রীমন্ত বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর শীলার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বুকের একান্ত সন্নিকটে তুলিয়া লইয়া বলিল—যদি তোমায় এখনো ভালবাসি! তুমি কি ভেবেছ শীলা যে, আমার এই সামান্য ক্ষতের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের সমস্তটুকু রক্তই বার হয়ে গেছে? কিন্তু শীলা, এ কি সত্যি?

অশ্রুসিক্ত চক্ষু দু'টি তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া শীলা বলিল—সত্যি! সত্যিই আমি চিরদিন ধ'রেই তোমায় ভালবাসি। তোমাকে দেখ্‌বামাত্রই মনের মধ্যে দুর্ব্বলতা অনুভব করতাম ব'লেই তোমার প্রতি নিষ্ঠুর হতাম। কিন্তু এখন থেকে আর কখনো তোমায় দেখে অবহেলা ক'রে মুখ ফিরিয়ে নেব না। এখন থেকে তুমি আমার—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া শীলা নিজের কুসুমপেলব বাহুর বাঁধনে শ্রীমন্তের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল ;—আবেশে তাহার দুই চোখ মুদিয়া আসিল।

পূর্ব্বাপর

শ্রীমন্তের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বিশ্বসংসার লুপ্ত হইয়া গেল। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিতা প্রিয়াকে বাহুপাশে বন্দী করিয়া তাহার ফুল্ল অধরে আপনার ওষ্ঠাধর স্থাপন করিল ... ...

... ...

চুব্‌ড়িটি তুলিয়া লইয়া শীলা বলিল—এখন আমি যাই, মা হয়ত কত ভাবচেন। তুমি এইবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও ;—জেনে রাখ, শীলা তার স্বামীকে ভিন্ন অপর কারুকে চুমু দেবার অধিকার দেয় না।

ক্ষিপ্রপদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীমন্ত জানালার ধারে আসিয়া বহুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বহুদূর হইতে সাগরের অশ্রান্ত কল্লোল তাহার কাণে কী এক অশ্রুত-পূর্ব্ব রাগিনীর আলাপ বহিয়া আনিতে লাগিল! —তাহারই মূর্চ্ছনায় আকাশের প্রতিটি তারকা যেন উদ্‌গ্রীব, নিষ্কম্প ;—বিশ্বপ্রকৃতি তন্দ্রালু!

অমিত ছিল সাধা-সিধে সরল স্বভাবের ভালো ছেলেটি,—কাব্য-প্রিয়, ভাবুক এবং রবীন্দ্র-ভক্ত। কবিগুরুর অনুষ্ঠিত উৎসব-আসরের কোনটিতেই এ-পর্য্যন্ত অমিতের উপস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটে নি। কাব্যগ্রন্থ থেকে আরম্ভ ক'রে 'শেষের কবিতা'র শেষ লাইনটি পর্য্যন্ত তার মুখস্থ!

অমিত যে আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ হ'য়ে উঠেছিল, কর্ত্তব্য-কঠোর পিতার কঠিন শাসন দিয়ে সে বেড়া তৈরী; তার ফাঁক দিয়ে সে কোনদিন ফাঁকা মাঠে এসে দাঁড়াতে পারে নি। উদার আকাশের উদাত্ত বাণী আর নক্ষত্রলোকের সুদূর ইঙ্গিত তার কল্পলোকেই মায়া-বিস্তার ক'রে চলেছিল।

ক্রমশঃ তার যৌবনের বনে যখন বসন্তের সমারোহ সুরু হ'ল, তখন নব নব ভাব-মুকুল বিকাশের সঙ্গে অমিতের মনে আরও যে একটি নব-জাগ্রত চেতনা দেখা দিল, সেটি হচ্ছে—নারীর সম্বন্ধে পুরুষের সেই আদিম এবং অনিবার্য্য কৌতুহল!

তাই, সে যখন কলেজের চার বছর পেরিয়ে 'দ্বারভাঙা-বিল্ডিংস্'-এ গিয়ে উঠ্‌লো, তখন তার মনের এই দিন দিন সংবর্দ্ধিত কৌতুহল তাকে দিগ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুললে; তার মনো-জগতে সহসা একটা বিপ্লব গেল ঘটে'! চিরদিন ধ'রে গ্রামের

পূর্ব্বাপর

অতি-পরিচিত একটিমাত্র পথে যে-লোকটি যাতায়াত ক'রে এসেচে, তাকে শহরের পাঁচ-মাথায় এনে ছেড়ে দিলে তার যে অবস্থা হয়, অমিতের অবস্থাও তার চেয়ে কিছুমাত্র কম বিপজ্জনক হ'য়ে উঠ্‌লো না। সে দিশাহারা হ'য়ে পড়ল।

পঞ্চম-বার্ষিক শ্রেণীর প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতায় ভর্ত্তি হবার কিছুদিনের মধ্যেই অমিতের জীবনে তিনবার তিন-রকমের দুর্ঘটনা ঘটল!... ...

সংস্কৃতের রেবা রায়কে দেখে, অমিত লুকানো-খাতায় কবিতা লিখলে। এক্‌জিবিশনে মেয়েদের ষ্টলে ইংরেজীর সুনীতা সেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, সঙ্গে যা-কিছু ছিল তাই দিয়ে সেখান থেকে বিনা-বিচারে কতকগুলি ছবি কিনে ফেল্লে। তর্ক-সভায় ইকনমিক্‌স্‌-এর নীতি বসুকে সম্মুখের আসনে দেখে জোর-গলায় নারী-প্রগতির স্বপক্ষে বক্তৃতা দিলে।... ...

এমনি ক'রে তার অনধিকৃত জীবনে যে-ক'টি তরুণী এসে পড়ল, তাদের কার পায়ে সে তার উচ্ছ্বসিত প্রেম নিবেদন ক'রে ধন্য হবে, তা কিছুতেই ঠিক করতে না পেরে সে মহা-সমস্যায় প'ড়ে গেল!

'শেষের কবিতা'র অমিতের সংঘাত সংঘটিত হয়—শিলঙ্‌ পাহাড়ের ওপর। আঁকা-বাঁকা সরু রাস্তা, ডানদিকে জঙ্গলে-ঢাকা খাদ্‌— সেইখানে।

আমাদের অমিতের সঙ্গে মেয়েটির যেখানে সংঘাত ঘটে, সে স্থানটি ঠিক অতখানি সুযোগপূর্ণ না হলেও নিতান্ত কম অনুকূল ছিল না।

মেয়েটির সঙ্গে একাকী একঘরে ব'সে থাকবার সময় অমিতের মনের ভাব কিরূপ হ'ত তা সে নূতন ডায়েরীর পাতায় লিখে রেখেছিল—

"...ঠিক একটার সময় নীতি এসে ঘরে ঢোকে; প্রথম প্রথম আমাকে দেখে ওর মুখে বিরক্তির কুঞ্চিত আভাস ফুটে উঠ্‌ত; এখন কিন্তু ও মৃদু হাসি দিয়ে ওর আগমন শুভ ক'রে তোলে! সারাক্ষণ ও-বই-এর মধ্যে ডুবে থাকে; দু'জনে কোনদিন কোন কথা হয় না; না-বলা বাণীর একটা বাঙ্‌ময় উচ্ছ্বাস দু'জনের বুকের বালুতটে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে! নীতিকে দেখে মনে হয় ঠিক যেন নীল আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে একটি বিদ্যুৎ-রেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারিদিকের সমস্ত হ'তে স্বতন্ত্র। দুর্লভ অবসরে আমি নীতিকে দেখেছি। দলবেঁধে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্ম-স্বরূপে ও দেখা দিত না" (অমিতের লেখার শেষের দিকে সতর্ক পাঠক 'শেষের কবিতার' ছাপ লক্ষ্য করবেন)

ব্যাপারটা হচ্ছে এই—

শ্রীমতী নীতি বসু নামধেয়া তরুণী ছাত্রীটির বিষয় ছিল অর্থ-শাস্ত্র। যে-বইগুলো ওদের বিশেষ পাঠ্য ব'লে নির্ব্বাচিত ছিল,

ছোট লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে সেগুলো ওকে পড়তে হ'ত, সাধারণ ছাত্রের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।

অমিতের বিষয় ছিল—ফাইন্ আর্ট্স। সেই সম্পর্কীয় অসংখ্য প্রাচীন বই এবং পুঁথি-পত্র পড়বার জন্য তাকেও ঐ ঘরে গিয়ে মাঝে মাঝে বসতে হ'ত। বইগুলি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং দামী ব'লে সাধারণ পাঠাগারে তাদের রাখা হ'ত না।

সুতরাং, এক আর এক-এ যেমন দুই হয়, সংঘাতও হ'য়ে উঠ্ল তেমনি অবশ্যম্ভাবী!

তারপর, কিছুদিনের মধ্যেই, অমিতের পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ এত বেশী বেড়ে উঠ্ল যে, করিডরের ওপর দাঁড়িয়ে দল-বেঁধে ছাত্রদের মধ্যে মেয়েদের সম্বন্ধে যে আলোচনা চলত, আর যার পুরোধা ছিল অমিত, সেখানে তাকে আর দেখা গেল না!

মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলি পরিপাটি ক'রে সাজানো, নিশ্চিহ্ন দাড়ি-গোঁফের তলায় সবুজ আভা, বাসন্তী-রঙের শর্ট্ পাঞ্জাবীখানি পরা, মোটা মোটা বই-এর ভারে নত, অমিত কলেজে এসে ঢুক্তো এগারোটায়, বার হ'ত সন্ধ্যায়;—সারাদিন একাগ্রচিত্তে অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনা, এবং বাকী সময়টুকু লাইব্রেরী ঘরে কাটানো,—এই ছিল তার প্রাত্যহিক কাজ!

পূর্ব্বাপর

অধুনা-পরিত্যক্ত বন্ধু-বান্ধবের দল তার আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেল। তাদের বারবার সনির্ব্বন্ধ আহ্বান উপেক্ষা ক'রে অমিত অমিত-উৎসাহে নব-জীবনের নূতন অধ্যায় সুরু ক'রে দিলে।

এতদিনের পর অমিত জীবনের পরিপূর্ণতার পথের সন্ধান পেয়েছে ;—অর্থাৎ তার সঙ্গে নীতি আলাপ করেচে! ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় ক'রে ওয়েলিঙ্‌টনও এতখানি চরিতার্থ বোধ করেছিলেন কি না সন্দেহ!

অমিত এখন বিশ্বজয়ী সম্রাটের মতো হাঁটে। কথা বলে অল্প, মৃদু মৃদু হেসে। জীবনটাকে তার কে যেন ভেঙে-চুরে আলাদা ধাতু দিয়ে গড়ে' তুলেছে!

গভীর রাত্রে উঠে, জানলার ধারে ব'সে, চাঁদের আলোর সাহায্যে অমিত তার মরক্কো-মোড়া খাতায় লিখলে—

—'অনন্তকাল ধ'রে মন যার তপস্যায় নিমগ্ন ছিল, এতদিনে তার দেখা পেলাম! এতদিন পরে যথার্থ ভালবাসার আস্বাদ পেয়ে তৃষিত অন্তরের বেলা-ভূমে পরিপূর্ণ তৃপ্তির তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে! যৌবন-চঞ্চল অন্তরের মোহ কেটে গিয়ে সুগভীর প্রেমের অমিয়-ধারায় অমিত-সত্তা হ'য়ে আপ্লুত গেছে!'

সেদিন ক্লাস বসবার অনেক পূর্ব্বেই অমিত কলেজে এসেছিল।

ইংরেজী ক্লাসের বন্ধু প্রশ্ন করলে—"এতো সকাল সকাল কেন হে ; তোমার ক্লাস ত দুটোয় ?"

—"এমনি এলাম।"

—"দেখি কি বই। এ কি! তোমার হাতে Song of songs ? ব্যাপার কি! ও বাবা! তাই না কি..."

বন্ধু হাসতে হাসতে পড়তে স্বরু ক'রে দিলে—

'শ্রীমতী নীতি বসুর করকমলে...'

—"বল কি, য়্যাঁ!..."

তার হাসিতে সারা বাড়ী যেন কেঁপে উঠ্ল!

অসিতটা একটা বর্ব্বর! মেয়েরা যাচ্ছে-আসছে, আর ও এমনি ক'রে—

ভাগ্যিস্ নীতি এখনো আসে নি!...

অমিতের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে,—কাণ দিয়ে আগুন ছুটুচে !

সুধীনটাও সময় বুঝে কোত্থেকে এসে উপস্থিত হ'ল ; খুব গোপনে অসিত বইখানি তাকে দেখিয়ে দিলে। সুধীনটা আবার অসিতের চেয়েও জোরে হাসে!

—"আরে, অমিত ত আজকাল মিস বোসের এডিকঙ্ হয়েছে ; তা জানো না বুঝি ?"

—"না ; কি রকম ?"

—"অমিত রোজ তাঁকে নিজের 'কারে' ক'রে বালিগঞ্জে পৌঁছে দেয়।"

—"তাই নাকি! হাঃ, হাঃ, হাঃ! 'কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্‌' অমিত।"

অমিত এবার জোরে জোরে বললে—"দেখ, তোমাদের এই সমস্ত insinuations অত্যন্ত অভদ্রোচিত! এ-সবের উত্তর আমি দেব না; তবে এটুকু জেনে রাখ—ব্যাপারটা তোমাদের ধারণার অতীত হলেও মেয়েদের সঙ্গে ভদ্রভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করা যায়!"

অমিত তার বই নিয়ে গট্‌গট্‌ ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেল। পিছনে দাঁড়িয়ে অসিত আর সুধীন নির্লজ্জের মতো হাসতে লাগল।

বই-খানা হাতে নিয়ে নীতি ঘাড় দুলিয়ে এমন মধুর ক'রে একটু হাসলে যে, অমিত কাল রাত থেকে উপহারের সঙ্গে যে-কথাগুলো গুছিয়ে রেখেছিল, সেগুলো সব এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল!

নীতি বললে—"How very sweet and kind of you! আমি একদিন কথাচ্ছলে বইখানার নাম আপনার কাছে বলেছিলাম, আপনি ঠিক মনে রেখেছেন ত! আশ্চর্য্য আপনার memory!"

অমিতের মনে হ'ল, তার মাথার ওপরেই আকাশ,—হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়। বললে—"আপনি বলেছিলেন...আমি ভুলবো? সামান্য আমার দান...আপনাকে...আপনি...আমি ...(মোহন-বাগানের ফুটবল-ম্যাচে গ্যালারিতে প্রবেশ করবার দুঃসাধ্য ব্যাপারের মতো অমিতের মনের কথাগুলো ঠেলাঠেলি করছে ; বেরুবার পথ পাচ্ছে না! শেষে—) আজ আচ্ছা ক'রে 'স্নাবিং' দিয়ে এলাম!"

নীতি একটু বিস্মিত হয়েই বললে—"কাকে?"

—"এই, আমার দু'জন বন্ধু,—বন্ধু না ছাই ; uncultured brutes...ওরা ভাবে...higher ideas ওরা ধারণাই করতে পারে না! ওদের সঙ্গে কথা বলব না আর!"

নীতি মিহিসুরে খানিকটা হেসে নিয়ে, শেষে বল্লে—"আজ আমার ছুটোয় ছুটি ; আপনাকে পাবো ত?"

—"নিশ্চয়! আমি as usual সিঁড়ির নীচে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।"

—Thanks!"

—"Need'nt mention!"

অমিত গোল-দীঘির ধার দিয়ে আসছিল।

পথিক-বন্ধুর অভাব নেই ; তাদের একজন প্রশ্ন করলে—"কিহে 'কার' কোথা গেল?"

মিথ্যা-ভাষণটা অমিত রপ্ত ক'রে উঠ্‌তে পারে নি আজও!

বল্লে—"একজন নিয়ে গেছেন।"

—"কে শুনি?"

অমিত আম্‌তা-আম্‌তা করতে লাগল। প্রেমের ধর্ম্মই হচ্ছে এই যে, মুখের অনন্ত গোপনতা সত্ত্বেও প্রেমিকের মন তার প্রিয়ার কথা বিশ্বের কানে শুনিয়ে দেবার জন্য সদাই উন্মুখ!

বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে অমিত বল্লে,—"আমার একটি লেডি-ফ্রেণ্ড্‌; এক সঙ্গে পড়ি; তিনিই—"

—"তিনি কি শুধ্‌ তোমার গাড়ী-খানি নিয়েই ক্ষান্ত আছেন?"

অমিত বিনা বাক্যব্যয়ে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল!

বন্ধু বল্লে—"যা হোক! Let your moon shed honied light ... নেমন্তন্নটা ফাঁকি দিস্‌ নে। গুড্‌-ডে।"... ...

অমিত অকারণে তার ওপর প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল—"বিজু! সময়মত একদিন আমার ওখানে যাস। কথা আছে।"

বিজু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

গোলদীঘির ভিতর ঢুকে অমিত দেখলে—সামনের বেঞ্চে সহপাঠী বিকাশ!

বিকাশের ওপর অমিতের মন বরাবরই বিমুখ ছিল। রুচি-হীনতার ওপর তার ছিল সব-চেয়ে বেশী বিতৃষ্ণা; ঐ-অপরাধে

সে যাদের অভিযুক্ত করত, তার প্রথম এবং প্রধান ছিল বিকাশ। তাই বিকাশকে দেখে তার মুখ মোটেই প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল না।

অমিতকে দেখে বিকাশ তার দন্তপংক্তি বিকাশ ক'রে বল্লে— "এসো অমিত, বোসো। তারপর, মিস বোসের খবর কি? তুমি না কি আজকাল তার বাহন হয়েছ?"

অমিত হাসতে-হাসতেই বল্লে—"ভদ্র-মহিলার সম্বন্ধে সম্ভ্রম দেখিয়ে কথা বোলো বিকাশ।"

—"ওঃ, গায়ে লেগেছে দেখছি; আরে, নীতির ব্যাপার কে আর না জানে! তোমাদের little affair-এর কথাও কারুর জানতে বাকী নেই।"

বিকাশের কথা বলার ভঙ্গী দেখে অমিত ভয়ানক রেগে গেল। যে মাত্রায় যতখানি সে রেগে উঠ্‌ত, সেই মাত্রায় ততখানি তার স্বাভাবিক জ্ঞান লুপ্ত হয়ে আসতো!

তার দিকে এগিয়ে গিয়ে অমিত বল্লে—"কি বলছ?"

বিকাশ বল্লে—"বলব আর কি! কিন্তু সাবধান বন্ধু! নীতিকে তুমি চেনো না; she has already jilted several simpletons like you ...।"

বিকাশের কথার শেষ দিক্‌টা আর শোনা গেল না। অমিত ধাঁ-ক'রে তার বলাই-চাটুয্যের-কাছে-শেখা বিদ্যে বিকাশের ওপর আরোপ করলে! তার সেই একটিমাত্র অব্যর্থ মুষ্টিযোগেই বিকাশ চোখে সংখ্যাতীত সর্ষেফুল নিরীক্ষণ করলে!

লোক জমে গেল। অমিত ক্রোধদীপ্ত চোখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিকাশ উঠে দাঁড়িয়ে তার মূর্ত্তি দেখে, আর কোন কথা না ব'লে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে' পড়ল, কতকটা ঠিক সেইরকম ক'রে,—শুদ্ধভাষায় যাকে বলে—বেত্রাহত কুক্কুরের মতো!

অমিত মহা ভাবনায় পড়েছে! সকাল থেকে নিজের পড়বার-ঘরে ব'সে সে চিন্তার অকূল সমুদ্রে তলিয়ে গেছে; কূল পাচ্ছে না। বাড়ীতে শুনেছে—তার বাবা তার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করছেন! এইটেই তার দুর্ভাবনার মূল!

পিতার এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাকে করতে হবে এবং সে তা করবেও—কিন্তু কেমন ক'রে?... ...

অমিতের বিপ্লব-বাসনার যিনি আদি-শক্তি, অমিত মনে মনে তাঁকে ধ্যান করতে লাগল। নীতির মধ্য দিয়ে অমিতের মানসী দেখা দিয়েছে; আর নীতিও তাকে... (কথাটা ভাবতেও অমিতের গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল)

প্রমাণ? হাঁা, প্রমাণ সে পেয়েছে। Song of songs হাতে নিয়ে নীতি উচ্ছ্বসিত আনন্দে লুটিয়ে পড়েছিল; অমিত চারদিন কলেজে যায় নি, দেখা হ'তে নীতি কী রকম উদ্বিগ্ন-মুখে তার পানে তাকিয়েছিল; এমনিতর আরও কত শত ছোট-খাটো কথা, টুক্‌রো হাসি, অব্যক্ত ইঙ্গিত!

অন্তরের গোপন কথাটি ত ঢাকের বিরাট্ বাদ্য-ধ্বনির মধ্যে প্রকাশিত হয় না; মধুচ্ছন্দা রাগিনীর মৃদুতার মাঝেই তার আভাস পাওয়া যায়! অমিত প্রমাণ পেয়েছে প্রচুর!

নীতির সম্মতি পেলেই সে বিদ্রোহী হবে।......বাবা যে বদ্‌রাগী, হয়ত এর জন্য তাকে...(অমিতের মুখ শুকিয়ে আসে) ...তাতে কি হয়েছে? নীতি যদি তার পাশে থাকে, তা হ'লে জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সে হেলায় তুচ্ছ করবে...

সে 'মহুয়া' খুলে বসল; বিপদের সময় রবীন্দ্রনাথের কাছ হ'তে অমিত পেতো অভয়-বাণী! প্রাণের রুদ্ধ আবেগ উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে সে আবৃত্তি করতে লাগল,—

"উড়াব ঊর্দ্ধে প্রেমের নিশান
    দুর্গম পথ মাঝে;
দুর্দ্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাবো
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাবো।

পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
    ছিন্ন পালের কাছি—
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
    তুমি আছ, আমি আছি।
দু'জনের চোখে দেখেছি জগৎ......"

পূর্ব্বাপর

মূর্ত্তিমান ছন্দ-পতনের মতো বেয়ারা এসে জানিয়ে দিলে, অমিতকে কর্ত্তা তলব করেছেন !

তাড়াতাড়ি বই বন্ধ ক'রে অমিত শঙ্কিত-চিত্তে পিতার ঘরের দিকে চল্‌ল। কবিতা-পড়া বাবা শুনতে পায় নি ত ! তা হ'লেই মুস্কিল !

অমিতের দিকে না চেয়েই তার বাবা বল্লেন—"আজ বিকেলে কোথাও বেরুস নি। বাড়ীতে দু'জন ভদ্রলোক আসবে।"

অমিত বুঝলে—তার 'উদ্বন্ধনকে' (কথাটা coin করেচে সে নিজেই) পাকা করবার জন্মই ভদ্রলোক-বেশী জল্লাদদের আগমন !

প্রতিবাদ-কল্পে খুব জোরালো গোছের কিছু-একটা বলতে গিয়ে তার মুখ দিয়ে কম্পিত স্বরে শুধু বেরুলো—

"আচ্ছা।"

দিনকয়েক পরের কথা।

সকাল থেকেই অমিতের কণ্ঠে গুন্ গুন্ ক'রে গানের সুর ভাঁজা চলেছে !

মা ভেবেছিলেন—ছেলে বোধ হয় বেঁকে বসবে। দেখে-শুনে তিনি আশ্বস্তা হয়েছেন।

ছোট বোন্ ভাবচে—বিয়ে না হতেই দাদার এত আনন্দ ! বিয়ে হ'লে না জানি—!

পূর্ব্বাপর

অমিত আজ আশ্চর্য্য-রকম নম্র হয়ে উঠেছে। পাড়ার যে-বন্ধুটির সঙ্গে দশ-বছর আগে ঝগড়ার ফলে এতদিন কথা বন্ধ ছিল, অমিত তার সঙ্গে যেচে কথা কয়েছে। বাড়ীর চাকরদের বিনা-ফরমাসেই বক্‌শিস্ দিয়েছে। আজ যেন ওর জীবনেতিহাসের 'রক্তাক্ষর-দিবস'।

খাওয়া-দাওয়া সেরে, পড়ার ঘরে ঢুকে, দেরাজ থেকে ডায়েরীখানা খুলে অমিত আর একবার লালকালির লেখাটা দেখে নিলে—

"বারই ফেব্রুয়ারী। এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্। মিস বোসেস্ টি-পার্টি। পাঁচটা ত্রিশ।"

আজ বারই ফেব্রুয়ারী! আজকের এই সান্ধ্য-উৎসবেই তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে। সে নীতিকে propose করবে। উত্তর সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত-নির্ভয়; তবু একবার নীতির মুখ থেকে সেই শাশ্বত মধুর কথাটি শুনে নেবে! তারপর......

অমিত চোখ বুজে শোনে, নিখিল বিশ্বের কবিগুরু যেন তাকে আশীর্ব্বাদ করছেন—

"আজি বসন্ত চির-বসন্ত হোক্
চির-সুন্দরে মজুক তোমার চোখ।
প্রেমের শান্তি চির-শান্তির বাণী
জীবনের ব্রতে দিনে-রাতে দিক আনি,
সংসারে তব নামুক অমৃতলোক!

পূর্ব্বাপর

অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। সুসজ্জিত টেনিস-লন—অভ্যাগত নর-নারীর কল-কণ্ঠে মুখর! লনের একধারে দাঁড়িয়ে অমিত। আসন্ন-গোধূলির আরক্ত-আভা তার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে!

ও-ধার থেকে অনিন্দিতা এসে তাকে অভিবাদন করলে।... ...

জলবায়ু এবং সিনেমা সম্বন্ধে অপর্য্যাপ্ত আলোচনার পর অমিত জিজ্ঞাসা করলে—"মিস্ বোস্ কোথায়? তাঁকে দেখছি না যে।"

অনিন্দিতা বল্লে—"সে তার আজকের chief guestকে নিয়ে ভিতরে গেছে তার বাবার কাছে। তিনি অসুস্থ কি না!"

অমিত বল্লে—"তা ত জানি; কিন্তু এই মাননীয় অতিথিটিকে ত চিনলাম না!"

অমিতের চোখের ওপর চোখ রেখে অনিন্দিতা বীণা-নিন্দিত-কণ্ঠে বল্লে,—"সময় হলেই চিনবেন।"

তারপর স্বর পাল্‌টে যোগ করলে—"সম্প্রতি বিলাত থেকে এসেচেন। নতুন ব্যারিষ্টার। বাপ হচ্ছেন—multi-millionaire! তিন-খানা 'রোল্‌স্-রয়েস্' !—ঐ যে—"

অস্তগামী সূর্য্যের শেষরশ্মি দিয়ে মাঠের ওপর যে ছায়াপথ রচিত হয়েছিল তারই ওপর দিয়ে নীতি আসছে—ময়ূরকণ্ঠী রঙের স্বরাটী সাড়ীর আঁচল মাটিতে লুটিয়ে! পাশে তার দীর্ঘকান্তি সুবেশ যুবা—চীফ্ গেষ্ট্!

পূর্ব্বাপর

অমিতের মন আশা-আশঙ্কায় আন্দোলিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

নীতির নির্ঝর-কণ্ঠ শোনা গেল—"এই যে, অমিত বাবু! আমাদের কি সৌভাগ্য! আসুন পরিচয় ক'রে দি। মিষ্টার ঘোষ, ইনি হচ্ছেন—অমিতবাবু, যাঁর কথা তোমায় মাঝে মাঝে লিখতাম! অমিতবাবু ইনি হচ্ছেন—মিষ্টার অজিত ঘোষ; my fiance!

অমিত মুখটা হাসবার মত ক'রে হাত বাড়িয়ে দিলে। মাঠের ওপর দিয়ে আলোর রেখাটুকু মিলিয়ে গেল। সূর্য্য ডুবে গেছে!

সেদিন শ্রাবণের শেষ-লগ্নে কলকাতা শহরে যে বহুসংখ্যক বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল, তারই একটীতে আমাদের অমিত ছিল বর।

শুভদৃষ্টির সময় বালিকা-বধূর পানে প্রসন্ন-নয়নে সে তাকিয়েছিল কি না, তা আমরা জানতে পারি নি; তবে তার বিবাহে যে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হয়েছিল প্রচুর, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম প্রত্যক্ষ!

পূর্ব্বাপর

অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। সুসজ্জিত টেনিস-লন—অভ্যাগত নর-নারীর কল-কণ্ঠে মুখর! লনের একধারে দাঁড়িয়ে অমিত। আসন্ন-গোধূলির আরক্ত-আভা তার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে!

ও-ধার থেকে অনিন্দিতা এসে তাকে অভিবাদন করলে।... ...

জলবায়ু এবং সিনেমা সম্বন্ধে অপর্য্যাপ্ত আলোচনার পর অমিত জিজ্ঞাসা করলে—"মিস্ বোস্ কোথায়? তাঁকে দেখছি না যে।"

অনিন্দিতা বল্লে—"সে তার আজকের chief guestকে নিয়ে ভিতরে গেছে তার বাবার কাছে। তিনি অসুস্থ কি না!"

অমিত বল্লে—"তা ত জানি; কিন্তু এই মাননীয় অতিথিটিকে ত চিনলাম না!"

অমিতের চোখের ওপর চোখ রেখে অনিন্দিতা বীণা-নিন্দিত-কণ্ঠে বল্লে,—"সময় হলেই চিনবেন।"

তারপর সুর পাল্‌টে যোগ করলে—"সম্প্রতি বিলাত থেকে এসেচেন। নতুন ব্যারিষ্টার। বাপ হচ্ছেন—multi-millionaire! তিন-খানা 'রোল্‌স্-রয়েস্'!—ঐ যে—"

অস্তগামী সূর্য্যের শেষরশ্মি দিয়ে মাঠের ওপর যে ছায়াপথ রচিত হয়েছিল তারই ওপর দিয়ে নীতি আসছে—ময়ূরকণ্ঠী রঙের সুরাটী সাড়ীর আঁচল মাটিতে লুটিয়ে! পাশে তার দীর্ঘকান্তি সুবেশ যুবা—চীফ্ গেষ্ট্।

পূর্ব্বাপর

অমিতের মন আশা-আশঙ্কায় আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ল।

নীতির নির্ঝর-কণ্ঠ শোনা গেল—"এই যে, অমিত বাবু! আমাদের কি সৌভাগ্য! আসুন পরিচয় ক'রে দি। মিষ্টার ঘোষ, ইনি হচ্ছেন—অমিতবাবু, যাঁর কথা তোমায় মাঝে মাঝে লিখতাম! অমিতবাবু ইনি হচ্ছেন—মিষ্টার অজিত ঘোষ; my fiance!

অমিত মুখটা হাসবার মত ক'রে হাত বাড়িয়ে দিলে। মাঠের ওপর দিয়ে আলোর রেখাটুকু মিলিয়ে গেল। সূর্য্য ডুবে গেছে!

সেদিন শ্রাবণের শেষ-লগ্নে কলকাতা শহরে যে বহুসংখ্যক বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল, তারই একটীতে আমাদের অমিত ছিল বর।

শুভদৃষ্টির সময় বালিকা-বধূর পানে প্রসন্ন-নয়নে সে তাকিয়েছিল কি না, তা আমরা জানতে পারি নি; তবে তার বিবাহে যে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হয়েছিল প্রচুর, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম প্রত্যক্ষ!

SERVICE STATION.

আমার দেবোপম পিতামহ

স্বর্গীয়

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

' Union

'পূর্ব্বাপরে'র প্রচ্ছদপটখানি এঁকে দিয়েছেন—শিল্পী-বন্ধু শ্রীযুত সুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য, এবং এর যাবতীয় প্রুফ্ দেখে দিয়েছেন—অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু। এ-দুটী কাজে এঁদের দুজনকেই অনেকখানি শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, এবং তা তাঁরা করেছেন, আমাকে ভালোবাসেন ব'লেই। সুতরাং বাহুল্য-বোধেই কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলাম না।

যে তরুণী যৌবন সম্পূর্ণ পুড়লে
জানি হে নবীন কোজারী
কোজারী মেরা তাহার তাহ:
জানি হে নবীন সংসারি

সত্যগোপাল

As the untaught spider spins his delicate rose-window and assures it against wind and rain by sheer adjustment—not a thread too many or too few—so let us writers of short tales try to spin out of our own instinct the round and threaded marvel. If in it we catch some hopeful editor and hold him to ransom—all the better for us ; but if we don't we have none the less fulfilled our being, and that is our real end in life ... ...

—*John Galsworthy*